বিশেষ সংখ্যা

মার্চ ২০২০ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

- তোমার জন্মদিন আমাদেরও
- কেন তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি

আবু সালেহ্, তৃতীয় শ্রেণি, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

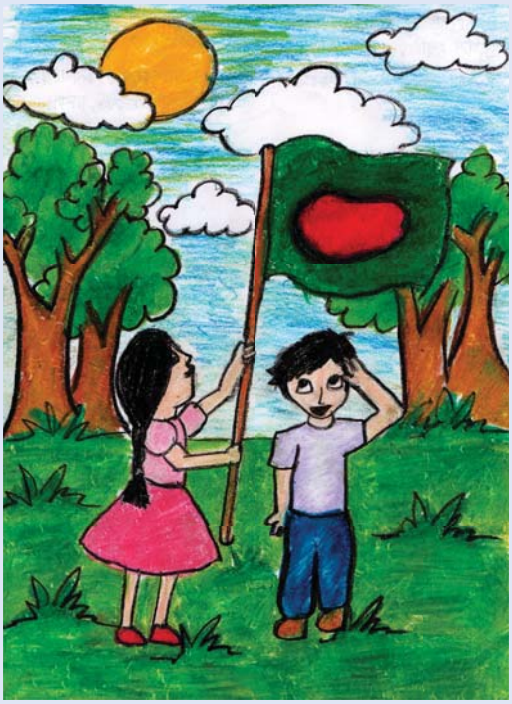

ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন
অষ্টম শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

মার্চ ২০২০ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৬

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

'জন্মদিন' শব্দটা শুনলেই মনটা ভালো হয়ে যায়, তাই না ছোট্ট বন্ধুরা! আমাদের সবার প্রিয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এ মাসের ১৭ তারিখ। খুশি লাগছে না খবরটা পেয়ে? আমি তো খুব খুশি। এই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছে গোটা জাতি। ১০ই জানুয়ারি শুরু হয়েছে মুজিববর্ষের অপেক্ষার ক্ষণগণনা। বন্ধুরা, তোমরা তো জানো ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু।

বন্ধুরা, জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্‌যাপন করবে। মূলত 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের প্রতিটি পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১৭ই মার্চ আমাদের জাতীয় শিশু দিবস। এই শিশু দিবসে সকল শিশুর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তোমরা স্বপ্নের চেয়ে বড়ো হও— এই কামনা মুজিববর্ষে।

সূচি

নিবন্ধ

০৪ তোমার জন্মদিন আমাদেরও/ সেলিনা হোসেন
০৯ কেন তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি/ ড. মোহাম্মদ হাননান
২৪ শেখ মুজিব যেভাবে বঙ্গবন্ধু হলেন/ কাজী সালমা সুলতানা
২৬ ২৫শে মার্চের কালরাত/ তাহমিনা কুরায়েশি
৩৯ মার্চ মুক্তির সূচনা মাস/ আলম শামস
৫২ মানবদরদি বঙ্গবন্ধু/ মঈনুল হক চৌধুরী
৫৯ বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রথম/ মেজবাউল হক
৬২ বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কিছু/ শাহানা আফরোজ
৬৬ কেমন করে এল/ পারভীন সুলতানা
৬৮ ব্যাতিক্রমী বঙ্গবন্ধু/ আরমান হোসেন
৭০ বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত সাইকেল/ রায়হান সাইফুর চৌধুরী
৭১ দেশে দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৭৩ 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করল ওয়াশিংটন ডিসি
মো. জামাল উদ্দিন
৭৪ মুজিববর্ষের দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৭৬ নন্দিনী হাইজিন কর্নার/ জান্নাতে রোজী
৭৯ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

২০ ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

স্মৃতিকথা

৩৪ বঙ্গবন্ধু ও দেওয়ান চাচা/ স.ম. শামসুল আলম
৫৬ আমার চোখে বঙ্গবন্ধু / জয়িতা শিল্পী

ভাষা দাদু

৭৭ বিপরীত শব্দ/ তারিক মনজুর

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

৩০ পালিয়ে গেছে পাকিভূত/ রফিকুর রশীদ

গল্প

১৮ জন্মদিন/আহসান হাবীব
৪১ স্মৃতিসৌধ/ ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান
৫৪ লাল পুটলি/ উৎপলকান্তি বড়ুয়া

কবিতা

০৩ অন্নদাশঙ্কর রায়
০৮ মুস্তাফা মাসুদ
৩৮ শেখ সালাহ্‌উদ্দিন
৪০ এইচ এস সরোয়ারদী/ নুসরাত হক
৪৩ জাহাঙ্গীর ডালিম
৫০ শাফিকুর রাহী
৬৫ ফায়েজা খানম
৬৭ দেলোয়ার হোসেন
৬৯ আবির মাহমুদ

কল্পবিজ্ঞান

৪৪ যদি রাত পোহালে শোনা যেত!/ নাসরীন মুস্তাফা

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: আবু সালেহ্, ফারাহনাজ সিদ্দিকী সিমিন
শেষ প্রচ্ছদ: তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ
০৩ কাজী নাফিসা তাবাসসুম
৪৯ মাশরুর সাকিব
৬৭ মাইশা মেহজাবিন (সুপ্তি)

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

কাজী নাফিসা তাবাসসুম, দ্বাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বঙ্গবন্ধু

অন্নদাশঙ্কর রায়

‘যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

দিকে দিকে আজ অশ্রুমালা
রক্তগঙ্গা বহমান
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়
জয় মুজিবুর রহমান।’

বঙ্গবন্ধু তোমার সঙ্গে হেঁটে যাওয়া আমাদের স্বপ্ন। হিমালয় পর্বতের চেয়ে বড়ো যদি কিছু থাকে সে তোমার উচ্চতা। বঙ্গবন্ধু তোমার উচ্চতা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে আমরা হেঁটে যাব হাজার বছরের বাংলাদেশে। আমাদের বাংলাদেশে পথের ধারে ফুটে থাকবে ফুল, গাছের ডালে থাকবে পাখির ঝাঁক, সোনালি ধানের শীষে ভরে থাকবে ক্ষেত, আর সব শিশুদের জন্য থাকবে নিরাপদ জীবন। শিশুদের কলকাকলিতে মুখরিত বাংলাদেশ স্মরণ করবে তোমাকে বঙ্গবন্ধু। স্মরণ করবে ত্রিশ লক্ষ অমর শহিদকে।

তোমার জন্মদিন আমাদেরও

সেলিনা হোসেন

তাই তো আমরা সমবেত কণ্ঠে বলি, তোমার জন্মদিন আমাদেরও। এদিন আমাদের আনন্দের, শেখার এবং নিজেদেরকে সাহসী করার দিন। ইতিহাস শেখার দিন। তোমার জন্মদিন আমাদের মানবিক অধিকার শেখার দিন। তোমার জন্মদিন আমাদের দেশ ও মানুষকে ভালোবাসা শেখার দিন। প্রতিদিনের স্মরণের মাঝে আমাদের জীবনে উদিত হবে নতুন সূর্য। ইতিহাস-ঐতিহ্যে টিকে থাকা তুমি আমাদের চিরকালীন মানুষ।

তোমার দেশে আমরা ভাগ্যবান প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু। জন্ম নিয়েই আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েছি। দেখেছি জাতীয় পতাকা। গেয়েছি জাতীয় সংগীত। আমাদের আছে সংবিধান। আমাদের জন্য আছে মুক্ত আকাশ। মাঠ ভরা ফসল। বিস্তৃত সবুজ। পাহাড়, নদী। আমরা জন্ম থেকেই এসব পাওয়ার

অধিকারী হয়েছি। আমাদের চারদিকে সবই আছে। এখন আমাদের বড়ো হয়ে ওঠার সাধনা করতে হবে। আমরা তোমার জন্মদিনে এই সাধনার শপথ গ্রহণ করি বঙ্গবন্ধু। আমরাও চাই তোমার মতো সাহসী মানুষ হব। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াব। দেশকে ভালোবাসব। আমরা তোমারই মতো হয়ে গড়ে উঠব বঙ্গবন্ধু।

আমরা তো জানি আধুনিক বিশ্বে সব ক্ষেত্রেই আছে প্রতিযোগিতা। আছে অর্থনীতির প্রতিযোগিতা, শিল্পের প্রতিযোগিতা, শিক্ষার প্রতিযোগিতা, জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, ক্রীড়ার প্রতিযোগিতা। সবার উপরে আছে মেধা-মনন ও সৃজনশীলতার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে অংশ নিতে হবে। নিজেদেরকে পিছিয়ে রাখা চলবে না। প্রতিযোগিতায় জয় আছে, পরাজায় নেই। পরাজয়ের অর্থ আমরা বদলে দিয়েছি। আমাদের কাছে পরাজয়ের অর্থ চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা। যারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় না তারা পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ে। আমরা পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ে হব না। পরাজয়কে স্বপ্নের জায়গায় নিয়ে যাব। স্বপ্নকে বুকে নিয়ে এগিয়ে গেলে জয় আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে। আমরা জীবনভর বড়ো মানুষ হওয়ার সাধনায় থাকব বঙ্গবন্ধু।

আমরা আজকের শিশু। আগামী দিনের পরিণত মানুষ হব। আমাদেরকে নিতে হবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক বিশ্বে দেশের মুখ উজ্জ্বল করব আমরা। নানাভাবেই তা করা যায়। আমাদের বড়ো ভাইয়েরা ক্রিকেটে বিশ্ব জয় করে জন্মভূমির গৌরব ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে দেশে। আমাদের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের গবেষণা কাজে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন দেশে। তাঁরা গৌরবের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে দেশকে। আমাদের অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে লেখাপড়া করছে। ভালো রেজাল্ট করছে। অনেক দেশের ছেলেমেয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করছে। আমাদের আপুরা হিমালয়ের চূড়ায় উঠেছে। ভাইয়ারাও পর্বতের চূড়ায় উঠেছে। তোমার দেশের সোনার ছেলেমেয়েরা যখন ভিন্ন দেশের মাটিতে লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়ে দেয় তখন বসন্ত বাতাস সে দেশের মানুষের হাসি নিয়ে তাকিয়ে দেখে জ্বলজ্বল করছে তোমার নাম। বঙ্গবন্ধু তুমি আমাদের এভাবে নিয়ে যাও দূর থেকে দূরে। আমাদের কানে বিপুল শব্দে বাজে তোমার বজ্রকণ্ঠ। 'আমরা করব জয়'- আমাদের এই জয়ের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন তোমার দেশের চারদিকে ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধু। তুমি আমাদের মাথার ওপর হাত রাখো।

আমরা শুনেছি ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ তোমার শেষ জন্মদিন পালিত হয়েছিল। তুমি অনেকটা সময় আমাদের মতো শিশুদের সঙ্গে কাটিয়েছিলে। সবাইকে বলেছিলে, তোমরা খেলো, দৌড়াও। গণভবনের মাঠ আজ তোমাদের, যা খুশি করার জন্য খোলা। শুধু তোমরা গাছের ডাল ভাঙবে না, ফুল ছিঁড়বে না। ঠিক তো? তোমাদেরকে নিজেদের পরিবেশ রক্ষা করা শিখতে হবে। আমরা গাছ নষ্ট করব না বঙ্গবন্ধু। সেদিন ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিল। তারপর কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর, স্কাউটস ও গার্ল গাইডের প্রায় সাত-আটশ ভাইবোন সেদিন গণভবনে তোমার জন্মদিন সাজিয়ে তুলেছিল। তোমাকে কাছে পেয়ে ওদের খুশির সীমা ছিল না। সেদিন তুমি গাড়ি থেকে নামতেই কচিকাঁচার মেলার ভাইবোনেরা গেয়েছিল গান। তোমার জীবনী পড়ে আমরা জেনেছি তোমার কৈশোরে তুমি ব্রতচারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলে। তোমার জন্মদিনের দিন ভাইবোনেরা ব্রতচারী আন্দোলনের একটি গান গেয়েছিল : 'সবার প্রিয় সকলের আদরণীয়/সকল কাজে বরণীয়/প্রভু এই মিনতি, দীর্ঘজীবন তারে দিও/সফল জীবন তারে দিও।' সেই সময়ে আমাদের ছোটো বন্ধুরা তোমার দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা করেছিল গানে গানে। বঙ্গবন্ধু আমাদের সামনে তুমি তো দীর্ঘজীবনেরই মানুষ। তোমার শারীরিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সেই মৃত্যুর বিপরীতে তোমার হাজার বছরের বেঁচে থাকা আছে বঙ্গবন্ধু।

তুমি বলেছিলে, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' পাকিস্তান কারাগারে তুমি দেখেছিলে তোমার কবর খোঁড়া হচ্ছে। তুমি ওদেরকে বলেছিলে, আমার লাশ আমার দেশে পাঠিয়ে দিও। এমনই নির্ভয় ছিল

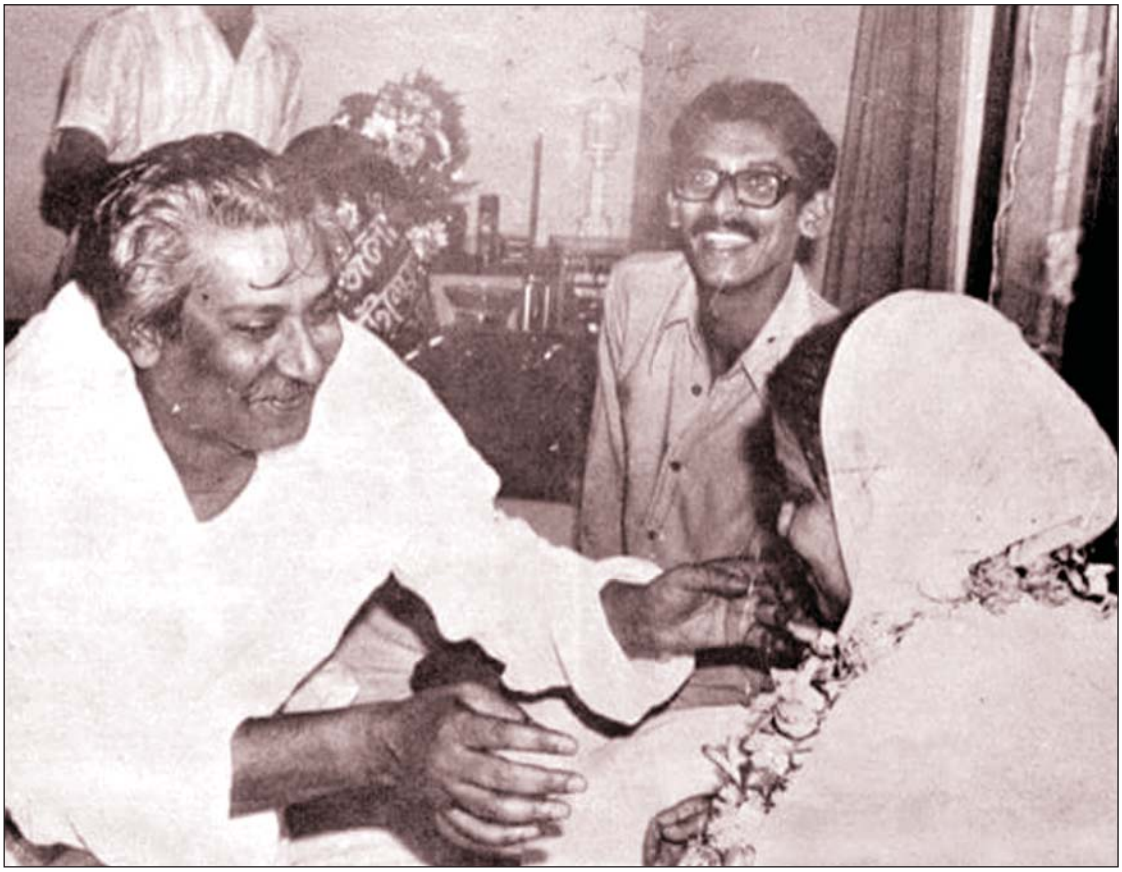

বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে স্ত্রীকে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন, ১৭ই মার্চ ১৯৭৫

তোমার বেঁচে থাকার সত্য। এভাবেই তুমি আমাদের আদর্শের জায়গা ঠিক করে দিয়েছ বঙ্গবন্ধু। আমরা ভুলে যাই না যে, মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য আমাদের লড়াই আছে। তুমিই তো প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় বক্তৃতা করেছিলে। আমরা ভুলে যাই না যে, আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই আছে। স্বাধীনতা অর্জনের গৌরব আছে। তুমিই তো বজ্রকণ্ঠে দেশের মানুষকে বলেছিলে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তুমিই তো সেই নেতা যিনি দেশের মানুষকে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়তে বলেছিলে। পাকিস্তান সরকারের দিকে আঙুল তুলে বলেছিলে, 'সাতকোটি বাঙালিরে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।' এইসব বাণী আমাদের সামনে তোমার তর্জনির মতো উঁচু হয়ে থাকে। বাংলার সব ধর্মবিশ্বাসী শিশু তোমার সেই কথা মনে রাখবে। তুমি বলেছিলে, 'বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান বাংলাদেশে যারা বসবাস করেন, তারা সকলেই এ দেশের নাগরিক। সকল ক্ষেত্রে তারা সমঅধিকার ভোগ করবেন।'

আমরা জানি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তুমি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলে। সেদিন তুমি তোমার ভাষণে বলেছিলে, 'আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু, মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।'

রমনা রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ভাষণে তোমার বজ্রকণ্ঠ আবার পৌঁছে গিয়েছিল মানুষের হৃদয়ে। বঙ্গবন্ধু

মানুষকে এত শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় দেখার মতো মনের সাহস সবার থাকে না। তুমি এক অসাধারণ মানুষ। তোমার মতো বুঝে ওঠার মানুষ আমরাও হতে চাই।

তুমি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সেবা দেয়ার জন্য ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছিলে। ১৯৭২ সালের ২৪শে মে বাংলাদেশ বিমানে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। সরকারের নির্দেশে কবির চিকিৎসার তদারকীর জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। তিনি তো সেই অমর কবি যিনি লিখেছিলেন : 'বল বীর চির উন্নত মম শির'। আমাদেরকে মাথা উঁচু রাখার এই ধারণা যে কবি তাঁর কবিতায় লিখে রাখেন তাঁকে তুমি যে সম্মান দিয়েছ তা আমাদের অহংকার।

তোমার রেখে যাওয়া কাজগুলো এখন আমাদের ভালোবাসার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের দায়িত্বে করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর হাত ধরে পথে হেঁটে যাই। তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ গ্লানিমুক্ত করার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু করার জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করেছেন। মানবতাবিরোধী অপরাধের কারণে তাদের বিচারের রায় হয়েছে। রায় কার্যকর হয়েছে। তিনি আমাদেরকে মর্যাদার জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা মাথা তুলে হেঁটে যাব পৃথিবীর পথে। বলব, আমরা দেশের মাটি কলঙ্কমুক্ত করেছি। আমরা বীর জাতি। আমরা সব পারি।

বঙ্গবন্ধু এই সময়ের শিশুরা এমন ধারণা নিয়েই বড়ো হবে। ওরা অনবরত বলবে সবার উপরে মানুষ সত্য। ওরা মানুষের অধিকার বুঝতে শিখবে। ওরা শিখবে মনুষ্যত্ববোধের ধারণাই মানুষের সবচেয়ে বড়ো ধারণা। মানুষ ধনী হতে পারে, গরিব হতে পারে কিন্তু মানুষ সমাজের নানা পেশার কারণে কখনোই নীচু শ্রেণির মানুষ হবে না। তার মানবিক মর্যাদার জায়গা উন্নত থাকবে। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা নিজেদেরকে তৈরি করছি বঙ্গবন্ধু।

২০১৫ সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ, এবং আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি তাঁর পুরস্কার দেশের মানুষকে উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের আশা আমরা এই অর্জনকে অনেক দূরে নিয়ে যাব- সেখানে ধ্বনিত হবে তাঁর কণ্ঠস্বর। আমরা আমাদেরকে বলতে চাই তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর কন্যা নন। তিনি এই মাটির সন্তান। শিশুদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিশুদের নিয়ে সরকারের বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা দেশজুড়ে চলছে। তিনি আমাদের মাথার ওপর ছায়া। তুমিও তো বঙ্গবন্ধু শিশুদের শিক্ষার জন্য ৩৭ হাজার প্রাইমারি স্কুলকে সরকারি স্কুলে পরিণত করেছিলে। শিশুদের জন্য আইন করেছিলে। তুমি বিশ্বাস করতে 'মানবজাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেয়ার আছে, শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য।' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অসংখ্য শিশু বাবা-মা হারিয়ে অনাথ ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। ১৯২৪ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'লীগ অব নেশনস্'-এর কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়েছিল সারা বিশ্বের শিশুদের জন্য এমন অসাধারণ উক্তি। তুমি গভীর চিন্তায় এই উক্তিকে তোমার দেশের শিশুদের জন্য কাজে লাগিয়েছিলে।

তোমার মৃত্যুর কত বছর পেরিয়ে গেল বঙ্গবন্ধু।

মার্চ মাস এলে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প। এই গল্প শুনে আমরা বড়ো হচ্ছি বঙ্গবন্ধু। আমাদের ইতিহাসে ৭ই মার্চ আছে। তোমার জন্মদিনের ১৭ই মার্চ আছে। ২৫শে মার্চের গণহত্যা আছে। এই দিন বীর বাঙালির যোদ্ধা হওয়ার সূচনার দিন। ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবস আছে। তোমার জন্মদিন স্বাধীনতার ইতিহাসে মিশে থাকে। তাছাড়া ঋতুরাজ বসন্তের এই সময়ে তোমার জন্মদিন বঙ্গবন্ধু। বসন্তের বাতাস তোমার জন্মদিনের সৌরভ ছড়ায়।

পৃথিবীর মানুষ ঠিক হতে পারে না। সীমান্ত পার হওয়ার জন্য শিশুদেরকে কাঁটাতারের বেড়ার নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিতে হয়। নিজ দেশ থেকে তাদের পালাতে হয় বাঁচার আশায়। ভূমধ্যসাগরের কূলে ভেসে আসে আয়লানের মৃতদেহ। বিশ্বজুড়ে মানুষ শিশু আয়লানের দিকে তাকিয়ে থাকে। বঙ্গবন্ধু বিশ্বজুড়ে শিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস এই পরিস্থিতি কাটবে। আমরা সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে বড়ো হব। আমরা তো জানি অশুভ নাশকতা দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ টিকিয়ে রাখতে পারে না। জাগ্রত বিবেকের মানুষেরা তা দমন করে। এমন চিন্তাই তুমি আমাদের জন্য রেখে গেছ। তুমি রয়েছ বাঙালির প্রাণে। বাংলাদেশের আয়ুতে। যতদিন রবে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ততদিন রবে তোমার নাম। তোমার শক্তি তোমার সাহস মিশে থাকবে বাংলাদেশের সবখানে। আর তোমার বজ্রকণ্ঠে ধ্বণিত হবে 'মানবজাতির সর্বোত্তম যা কিছু দেবার আছে, শিশুরাই তা পাওয়ার যোগ্য।' আমাদের বুকের ভেতরে থাকবে এই বাণী। আমরা এই বাণী পৌঁছে দেবো তাদের সবার কাছে যারা আমাদের পরে আসবে এই বাংলাদেশে। ধরবে দেশের হাল। ভাসবে পঙ্খিরাজ নাও। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অমর বাণী নিয়ে তাঁর দেশের শিশুদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

মার্চ মাস এলে শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প। এই গল্প শুনে আমরা বড়ো হচ্ছি বঙ্গবন্ধু। আমাদের ইতিহাসে ৭ই মার্চ আছে। তোমার জন্মদিনের ১৭ই মার্চ আছে। ২৫শে মার্চের গণহত্যা আছে। এই দিন বীর বাঙালির যোদ্ধা হওয়ার সূচনার দিন। ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবস আছে। তোমার জন্মদিন স্বাধীনতার ইতিহাসে মিশে থাকে। তাছাড়া ঋতুরাজ বসন্তের এই সময়ে তোমার জন্মদিন বঙ্গবন্ধু। বসন্তের বাতাস তোমার জন্মদিনের সৌরভ ছড়ায়। আমাদের দিনগুলো আলোকিত রাখে। তোমার জন্মদিন আজকের বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস। জয় হোক জাতীয় শিশু দিবসের। শিশুদের সামনে মঙ্গল প্রদীপ জ্বলে থাকুক। এই প্রদীপের অনির্বাণ শিখা কোনোদিন নিভে যাবে না। আমরাই নিভতে দেবো না। ■

একটি ফুল চিরঞ্জীব

মুস্তাফা মাসুদ

হৃদয় জুড়ে একটি মোহন ফুল ছিল,
ভালোবাসার মিষ্টি হাওয়ায় দুলছিল;
স্বপ্নছোঁয়া সুরের কাঁপন তুলছিল,
কোটি মানুষ দুঃখ-ব্যথা ভুলছিল;
আঁধার চিরে আলোর তোরণ খুলছিল–
সেই ফুলটিই এসব কিছুর মূল ছিল।

সেই ফুলটি জাতির পিতা শেখ মুজিব,
যার নামটি আজো অমর, চিরঞ্জীব।
সেই ফুলটিই স্বাধীনতার শক্তি-প্রাণ,
দেশটা জুড়ে মুক্ত হাওয়ায় ছড়ায় ঘ্রাণ।
আমরা আজো তার সাহসে পথ চলি,
হানাদারের ভূতগুলোকে পায়ে দলি।

কেন তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি

ড. মোহাম্মদ হাননান

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলার ইতিহাসের 'সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' নির্বাচন করে। নির্বাচনের পূর্বে তারা এ-সংক্রান্ত কয়েকটি জরিপও পরিচালনা করে। যেদিন জরিপ-ফলাফল সম্প্রচারিত হয়। সেদিন বাংলাদেশের বিশিষ্ট দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম এক আবেগময় লেখা লেখেন। লেখাটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ–

আজ ছিল ১ বৈশাখ, বুধবার। আমি রমনার বটমূলে যেতে পারিনি। কিন্তু আজ ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য ছিল। তার একটা আভাস পেলাম সৌরভ-রতন, তনু, ওরা যখন ওদের প্রেসক্লাবে আয়োজিত আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিতে আমাকে একটি ট্যাক্সিতে করে নিয়ে যেতে গিয়ে জ্যামে পড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে আধঘণ্টার রাস্তা এক ঘণ্টাতেও পেরুতে পারছিলাম না, সেই ঘটনা দেখে। রতনতনু প্রতি মুহূর্তে ওর মোবাইল থেকে প্রেসক্লাবে রাইটার্স ফোরামের প্রধান রাহাত খানকে কেবল বলছিল : এই কাওরান বাজার ছাড়িয়ে রেললাইন পেরুচ্ছি। এই তো প্রেসক্লাবের কাছাকাছি পৌঁছেছি। আমি খোঁড়া মানুষ বলে সকালে রাস্তায় বেরুতে পারিনি। তাই এই লোকারণ্যের দৃশ্য আমার জন্য দস্তুরমতো চমকই ছিল।

কিন্তু আসল চমক আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল রাত সাড়ে ১০টার বিবিসি'র সম্প্রচার।

'৭১ সালের যুদ্ধের সময়ে, নিজে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত, একদিনের জন্যও বোধ হয় বিবিসি শোনা বন্ধ করিনি। কেবল আমি নই, আমরা সবাই। আমরা বিবিসি'র তিন অক্ষর ভেঙে পুরো তৈরি করেছিলাম: 'বাংলাদেশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন', ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন নয়।

আজও রাত সাড়ে ১০টার সম্প্রচার আমার মনে '৭১-এর সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনে দুর্দান্ত এক চমকের সৃষ্টি করল। আজকের বিবিসির সম্প্রচারে সংগঠক হিসেবে কে কে ছিলেন তাঁদের নাম আমি মনে রাখতে পারিনি। কিন্তু 'ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে' এরকম একটা অকল্পনীয় জরিপ হাতে নিয়ে তারা

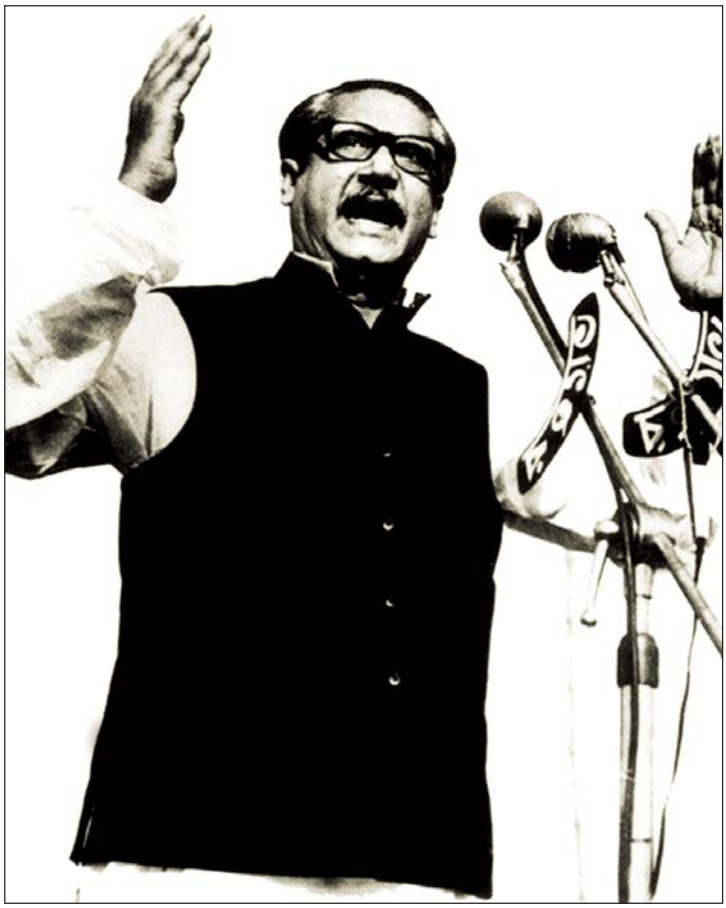

যে কেবল আমাদের বিস্মিত করেছিলেন, তাই নয়। তাঁরা নাটকীয়তা শুরু করেছিলেন মহাশূন্যে যাওয়ার কাউন্টডাউন পদ্ধতি গ্রহণ করে, ২০ থেকে শুরু করে, ২০তম অমুক, ১৯তম অমুক, তারপর আঠারতম অমুক। শেষের দিকে গতকাল ২য় স্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকেও ঘোষণা করলেন অমুক বলে। এবার বাকি রইল ১ নম্বর কে? এবং এভাবে এমন নিশ্ছিদ্র অনুমানের আবহাওয়া তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন যে, আজ সকালেও আমি কল্পনা করতে পারিনি।

সেই বাকি ১নম্বর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে?

এটা জানার জন্য সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার বিবিসি ধরতে না পারলাম তো অপেক্ষা করলাম সাড়ে ১০টার জন্য এবং সাড়ে দশটাতে 'বিবিসি' তথা ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন পৃথিবীকে চমকে দিলো যে ঘোষণাটি দিয়ে তার ভাষা ছিল : আমাদের জরিপের শ্রোতারা বলেছেন যে, বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান!...

আমি আর দেরি না করে আমার মিনি ক্যাসেট রেকর্ডারটি চালু করে এই নাটকটির সবটাই রেকর্ড করে রাখলাম : বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তার দ্ব্যর্থহীন জবাব : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের এ দল, ও দল, সে দলের পত্রিকার হেডলাইন নয়। পৃথিবীব্যাপী পরিচিত ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা : অন্য কারো সঙ্গে যুগ্মভাবেও নয়, একেবারে এককভাবে : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

এমন অনুমান হয়ত কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু বিবিসির জরিপের ফল অনুমানের মধ্যে রেখে আমরা শান্ত থাকতে পারছিলাম না, যতক্ষণ না সন্ধ্যা সাড়ে সাত এবং রাত সাড়ে দশটায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণসহ বিবিসি ঘোষণা করল ২০তম থেকে কাউন্টডাউন শুরু করে জরিপকে ১নম্বর-এ এসে ও থামতে হয়েছে : বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[১]

বিবিসি-র মূল্যায়ন ও সরদার ফজলুল করিমের আবেগময় এ ভাষণের একটা ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আলোচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে হাজার বছর ধরে আগত বাঙালি নেতাদের প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে নিয়ে আসতে হয়। যুগের-পর-যুগ, শতাব্দীর-পর-শতাব্দী হাজারো বাঙালি সন্তান এ দেশ, এ জাতি, এ ভাষার বিকাশ ও শ্রী বৃদ্ধি সাধনে অবদান রেখেছেন। তবে বাঙালির ইতিহাসের হাজার বছরের পরিক্রমায় আমরা প্রথম যে, বিশিষ্ট বাঙালির পরিচয় পাই তিনি অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ দীপঙ্কর যতখানি না বাঙালির ধর্মনেতা ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী। বস্তুত সেই প্রাচীনকালেই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অতীশ দীপঙ্করের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বাঙালির জাতিসত্তা ও ইতিহাস নির্মাণে অতীশ দীপঙ্করের বিশেষ কোনো ভূমিকার কথা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

তবে বাঙালির ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন ভিন্ন কারণে। তিনিই গণতান্ত্রিকভাবে প্রথম রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন 'প্রকৃতিপুঞ্জ' নামে সাধারণ জনগণ দ্বারা। গোপাল ছিলেন খাঁটি বাঙালি এবং অব্রাহ্মণ সাধারণ বাঙালি। ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ৭৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা গোপালের শাসন বাংলার ইতিহাসের চাকা আমূল বদলে দিয়েছিল।

কিন্তু পাল-শাসনেরই বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমজীবী কৃষক-কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন প্রথম বাঙালি বিদ্রোহী দিব্যোক। বাঙালি শ্রমজীবী মানুষের এই অভ্যুত্থানকে ইতিহাসমণ্ডিত করে অমর হয়ে আছেন বাঙালির সাধারণ মানুষের এই নেতা।

১২০৪ সাল থেকে তুর্কি-শাসনের মধ্যদিয়ে বাংলার ইতিহাস নতুন গতিপথ লাভ করে। একমাত্র চৈতন্যদেব ছাড়া এই সময়ে গোটা মধ্যযুগ জুড়ে উল্লেখযোগ্য আর কোনো বাঙালি নেতা পাওয়া যায় না। কিন্তু চৈতন্যদেব রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের চেয়ে ধর্মীয় সংস্কার নিয়েই তাঁর বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন। ফলে বাঙালির আর্থসামাজিক পট পরিবর্তনে তিনি ভূমিকা রাখতে পেরেছেন খুব কম।

অন্যদিকে বাংলার বারো ভূঁইয়ারা ঐক্যবদ্ধভাবে

পাঠান-মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই বাংলাকে দিল্লির অধীনতা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছিল। বাঙালির ইতিহাসে ঈশা খাঁ-মুসা খাঁ, চাঁদ রায়-কেদার রায়, ফজল গাজী-প্রতাপাদিত্যরা ট্র্যাজেডির নায়ক হিসেবেই বাংলাকে বারো খণ্ডে বিভক্ত করে রেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত বাংলাকে স্বাধীন কিংবা ন্যূনতম ঐক্যবদ্ধও তাঁরা করতে পারেননি।

বাংলার ইতিহাসে ইংরেজ-আগমনের ঘণ্টাধ্বনি বেজেছিল নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে। নবাব সিরাজ বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু বাংলার শেষ নবাবের ট্র্যাজিক মৃত্যুতে বাঙালির হৃদয়ে তাঁর স্থায়ী আসন গড়ে ওঠে।

আর বাঙালির হৃদয়ের এই আবেগের কারণেই বাংলা থেকেই প্রথম ইংরেজ বিতাড়নের কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকায় সিপাহিদের বিদ্রোহে যখন ঢাকার নবাবদের পূর্বপুরুষ অবাঙালি খাজা আবদুল গণি ইংরেজদের দালালি করছেন, তখন বাঙালি জাতীয় বীর কেরামত আলী অসীম সাহসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

মির নিসার আলি তিতুমিরও বাঁশের কেল্লা বানিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন এবং বিদ্রোহী বাঙালির শৌর্যবীর্যকে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করতে পারেননি।

তবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাঙালির শৌর্য ও বীর্যকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যতখানি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন, তার চেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি বলেছিলেন–তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো। বাঙালি বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সুভাষ বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে, কিন্তু বাঙালির স্বাধীনতা আসেনি। বাঙালি বরং ভাগ হয়ে যায়, দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বাধীনতার জাঁতাকলে। পূর্ববাংলার বাঙালিরা পাকিস্তানে, পশ্চি মবাংলার বাঙালিরা ভারতে ভাগ হয়ে গেল।

রাজশাহী সফরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শেখ মুজিব, ১৯৫৪

হাজার বছরের ইতিহাসের ধারায় আরো অনেক বিশিষ্ট বাঙালির পরিচয় রয়েছে। লালন শাহ, ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আলাউদ্দিন খাঁ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সত্যজিৎ রায়, হাছন রাজা, জয়নুল আবেদীন, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া, শহিদ জননী জাহানারা ইমাম, কবি সুফিয়া কামাল, অমর্ত্য সেন, জ্যোতি বসু—এরকম আরো অনেক। এদের প্রত্যেকেরই কোনো-না-কোনো বিশেষ ধারায় বাঙালির জাতিসত্তাকে বিশ্বে পরিচিত করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

পাকিস্তান আমলে এসব প্রশ্নে বাঙালির আবেগের নেতা হয়ে এসেছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। কিন্তু নানারকম ষড়যন্ত্র, দ্বন্দ্ব এবং শাসকচক্রের কূটচালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের সম্ভাবনা স্তিমিত হয়ে আসে। তবে তাঁর সমসাময়িক রাজনীতিবিদ উর্দুভাষী বাঙালি নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীরই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ফুটে উঠেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসক চক্র সে সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই উপড়ে ফেলে।

কিন্তু অঙ্কুরেই মূলোৎপাটনের এই পাকিস্তানি কর্মসূচি ব্যর্থ হয় তরুণ ও সম্ভাবনাময় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের বেলায়। শেখ মুজিব বাঙালির হৃদয়ের প্রাণটি যথার্থই ধরতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সকল কিছুরই ভিত্তিমূল হয়ে দাঁড়ায় বাংলার ছাত্রসমাজ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই তিনি পাঞ্জাবি শাসক কুলের সমর্থকদের হাত থেকে বের করে এনে ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি ছাত্রলীগকে পুনর্গঠিত করেন। বাঙালির স্বাধীনতার ও স্বাধিকার আন্দোলনের সকল কর্মসূচিরই প্রথম ভিত্তি রূপ লাভ করে ছাত্রলীগের পুনর্গঠনের মধ্যদিয়ে।

এরপর থেকে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলার ও বাঙালির চেতনা বিনির্মাণে একের-পর-এক কর্মসূচি। ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে বন্দি অবস্থায়ও তিনি এর অদৃশ্য নেতা। কারণ দেখা যায়, আন্দোলনের দাবিদাওয়ায় শেখ মুজিবুরের মুক্তির প্রশ্নই অগ্রাধিকার পেয়েছে সকল কর্মসূচিতে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঐক্যমোর্চার প্রধান প্রাণপুরুষ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যুবাবয়সী হলেও সেই সময়েই আওয়ামী লীগের প্রধান নেতায় পরিণত হয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। এর প্রমাণ মেলে অন্যত্র, হক-মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবের যোগদান প্রশ্নে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে পুরো আওয়ামী লীগই যুক্তফ্রন্ট সরকারে যোগ দিতে সেদিন বিরত থেকেছিল।

বাংলা এবং বাঙালিত্ব সম্পর্কে আপোশহীন এই নেতার কর্মকাণ্ড প্রথম থেকেই ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল পাকিস্তানি পাঞ্জাবি শাসক চক্রকে। ১৯৫৫ সালের ২৫ শে আগস্ট করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান পার্লামেন্টের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ ভাষণ এই জাতির ইতিহাস বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিন পাকিস্তান পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :

Speaker Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should make Bengal/'Pakistan'. The word 'Bengal' has a history, has a traditon of its own. You can change it only after the people have been consulte.[২]

এভাবে পূর্ববাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং চেতনাকে ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম থেকেই নিজের পরিকল্পনাকে গুছিয়ে আনতে শুরু করেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছিলেন সচেতন এবং অবিচল। তিনি জানতেন তিনি কী করতে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম যে সুকঠিন এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ তা তাঁর জানা ছিল। তিনি এও জানতেন, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামের ডাকে সাড়া দেওয়ার মতো শক্ত বুকের পাটার অনেক বাঙালি নেতারও অভাব রয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচির প্রধান অবলম্বনই হয়ে ওঠে তৎকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ এবং আওয়ামী লীগের তরুণ-নেতৃত্ব।

সামরিক শাসকদের ফাঁদে বরাবরই পা দিয়েছেন কিছু কিছু বাঙালি রাজনৈতিক নেতা। এদের চক্রান্তের অংশ হিসেবেই ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব

বাংলায় বেশ কয়েকটি পরিকল্পিত দুর্ঘটনার জন্ম দেওয়া হয়। এর মধ্যে আদমজি পাটকলে নোয়াখালী বনাম অন্যান্য জেলা শ্রমিক-দাঙ্গা এবং প্রাদেশিক সংসদ ভবনে সদস্যদের আত্মঘাতী লড়াই ছিল অন্যতম। পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সামরিক আইন জারির ক্ষেত্রে এই ঘটনাসমূহের সূত্রই ব্যবহার করা হয়েছিল।

বাংলা এবং বাঙালিত্ব সম্পর্কে আপোশহীন এই নেতার কর্মকাণ্ড প্রথম থেকেই ভাবনায় ফেলে দিয়েছিল পাকিস্তানি পাঞ্জাবি শাসক চক্রকে। ১৯৫৫ সালের ২৫শে আগস্ট করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান পার্লামেন্টের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ ভাষণ এই জাতির ইতিহাস বিনির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ।

খুব সহজ ছিল না সামরিক শাসনের এই ভয়াবহ বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসা। ১৯৬২ সালের ৩১শে জানুয়ারি শাসক আইয়ুব খানের উপস্থিতিতেই ঢাকা শহরে ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ সামরিক শাসন বিরোধী মিছিল বের করে দিয়ে শেখ মুজিব বস্তুত প্রকাশ্যেই চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। এই সাহসের সূত্রেই ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির সনদ ৬-দফা ঘোষণা করে বাংলার অবিসংবাদিত নেতারূপে আবির্ভূত হন। বস্তুত ৬-দফা ছিল বাঙালির স্বাধীনতার ১-দফা কর্মসূচিরই প্রাথমিক ধাপ।

বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে ৬-দফার প্রয়োজন ছিল। বঙ্গবন্ধু জাতির জন্যে কী করতে যাচ্ছেন, ৬-দফা ছিল দেশের মানুষের জন্য একটা বিশেষ 'ম্যাসেজ'। এতে প্রাণ-সংশয়ের ঝুঁকি ছিল, কিন্তু বাঙালি জাতির হাজার বছরের স্বপ্ন ও গৌরবকে ফিরিয়ে দিতে তিনি সেই ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন।

৬-দফাকে মোকাবিলা করতে পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল তৎকালীন 'চীনপন্থী কমিউনিস্ট বিপ্লবী' বলে পরিচিত একদল স্তাবককে দিয়ে প্রচারণা চালানো। এই বিপ্লবীরা বলে বেড়াতে থাকে যে ৬-দফা হচ্ছে আমেরিকার সিআইএ (গোয়েন্দা সংস্থা)-এর একটি দলিল। এদের কেউ কেউ বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানকে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নেতা' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন (১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর 'বাম নেতা' বলে পরিচয়-প্রদানকারী আনোয়ার জাহিদ 'জনতা' পত্রিকায় আইয়ুব খানকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নেতা বলে উল্লেখ করেছিলেন)।

এদিকে পাকিস্তানি নেতাদের ভাষায় 'পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করে ফেলার অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও চলতে থাকে। ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথম সপ্তাহে কয়েক দফা ঘোষণায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করে জানায়, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার একটা চেষ্টা তাঁরা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে এই পরিকল্পনার 'মূলনেতা' বলে পাকিস্তান সরকারের অভিযোগে প্রকাশ পায় এবং তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করা হয়। শেখ মুজিব তখন কারাগারেই ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তাঁকে বেকসুর খালাস দিয়ে সামরিক বিধির আওতায় জেলগেটেই আবার ১৮ই জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয়। মামলার তদন্তে আগরতলা মামলার সত্যতার অনেক দলিল ও তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান ছাড়লেন না। ভেবেছিলেন, আগরতলা মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে শেষ করে দেওয়া যাবে।

নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৭০

কিন্তু যে বাঙালির একটি স্বাধীন আবাসভূমির জন্য শেখ মুজিব নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন, সেই বাঙালির ভালোবাসাই তাঁকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। এই পটভূমিতেই শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর মুক্তিকামী বাঙালি জাতির এটা ছিল তাঁর প্রতি প্রথম পুরস্কার। আর এই খেতাব প্রাপ্তির মধ্যদিয়ে তিনি জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি আরো দায়বদ্ধ হয়ে পড়েন।

এই পটভূমিতেই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে তিনি বাঙালি জাতির 'ম্যান্ডেট' হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীও উপলব্ধি করতে সমর্থ হন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতেই বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নপূরণের ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ফলে বাঙালির ভোট যাতে ভাগ হয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে তিনি এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাঁর দল ন্যাপকে ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে বিরত রাখতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হন। এর ফলে বাঙালিরা এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে উপমহাদেশের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়।

বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা ও বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেও যেসব স্লোগান বেছে নিয়েছিলেন তাও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭০ সালেই বঙ্গবন্ধু স্লোগান তোলেন :

আমার দেশ-তোমার দেশ : বাংলাদেশ-বাংলাদেশ
তোমার আমার ঠিকানা : পদ্মা-মেঘনা-যমুনা
জাগো জাগো : বাঙালি জাগো
জয় বাংলা।

এর ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ জনগণের 'ম্যান্ডেট' লাভ করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের মধ্যেও প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করেন, যে স্বপ্ন তাঁকে আজীবন লালন করে এসেছে তাঁর বাস্তবায়নে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তিনি জানতেন পাকিস্তানিরা বাঙালিদের হাতে কোনোদিন ক্ষমতা তুলে দেবে না। ফলে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের মুখে পয়লা মার্চ বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে 'যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে' নির্দেশ দেন (দৈনিক *আজাদ*, *সংবাদ*, *ইত্তেফাক*, ২রা মার্চ ১৯৭১)। ১৯৪৮

সালে বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগকে পুনর্গঠিত করেছিলেন, তাঁর সেই ছাত্রলীগ ২রা মার্চ (১৯৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে উড়িয়ে দেয়।

৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে লাখো মানুষের সমাবেশে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলা ঘোষণার সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। এই সমাবেশের ঘোষণায় বলা হয়েছিল:

> *স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়েছে।*
> *স্বাধীন দেশের জাতীয় সংগীত হবে 'আমার সোনার বাংলা'।*
> *বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।*

বাঙালির এই ঐতিহাসিক ঘোষণা ও সিদ্ধান্তের বিস্তারিত বিবরণ পরদিন ৪ঠা মার্চ দেশের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর 'এবারের সংগ্রাম: স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা সমগ্র দেশকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত করে তুলেছিল। বঙ্গবন্ধুর এই ডাক টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সর্বত্র সংকেত-ধ্বনিতে করেছিল।

১৯৭২ সালে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিট ফ্রস্টের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন :

> ৭ মার্চ যখন আমি ঢাকা রেসকোর্স মাঠে আমার শেষ মিটিং করি, ঐ মিটিং-এর উপস্থিত দশ লাখ লোক দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানকে স্যালুট জানায় এবং ঐ সময়ই আমাদের জাতীয় সংগীত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়ে যায়।... আমি জানতাম কী ঘটতে যাচ্ছে, তাই আমি ৭ মার্চ রেসকোর্স মাঠে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেছিলাম এটাই স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যুদ্ধ করার মোক্ষম সময়।...

এভাবে একটি জাতির স্বপ্নকে তিনি ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জাতিকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন।

২৩শে মার্চ (১৯৭১) বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে তাঁর বাসভবনে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এরই মাধ্যমে ২৪ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১) বাংলায় পাকিস্তানের পাঞ্জাবি-শাসনের কবল থেকে মুক্তির ঘোষণা আনুষ্ঠানিকতা লাভ করেছিল। এর আগে ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ-নেতারাও পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এই প্রথম পতাকা-উত্তোলনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের অনেক পূর্বেই বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের এই স্বাধীন বাংলার পতাকা তৈরি করে রেখেছিলেন। একটি দেশের জন্মের বহুপূর্বেই জাতির পিতা তাঁর দেশের পতাকার পরিকল্পনাটিও করে রেখেছিলেন—তা শুধু রোমাঞ্চকরই নয়, লক্ষণীয় ব্যাপার হলো তাঁর একার চিন্তা থেকেই পরিকল্পনাটি এসেছিল।

সমসাময়িক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যান্য বাঙালি রাজনীতিকরাও বঙ্গবন্ধুর একচ্ছত্র নেতৃত্ব স্বীকার করে তাঁর কাছেই বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠত্বের আসনটি তুলে দিয়েছিলেন। ৯ই মার্চ (১৯৭১) ঢাকার পল্টন ময়দানে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী লাখো জনতার সমাবেশে বলেন :

> মুজিবের নির্দেশমতো ২৫শে মার্চের মধ্যে কোনো কিছু না হলে আমিও তাঁর সাথে মিলে ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করব।... মুজিবকে আমি ভালো করে চিনি।... আমি শেখ মুজিবকে আমার তিন পুত্রের চেয়েও ভালোবাসি। আমার রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমি ৩১ জন সেক্রেটারির সাথে কাজ করেছি। তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানই শ্রেষ্ঠ।[৩]

ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গ্রুপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সবকয়টি সংগঠনও বঙ্গবন্ধুর সূচিত অসহযোগ আন্দোলনে এসে শরিক হয়। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার একচ্ছত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এমনকি 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' উপাধি এবং সম্মাননাও তিনি তাঁর জনগণের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেই লাভ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর

২৩শে ফেব্রুয়ারি কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে রেসকোর্সের সংবর্ধনা-সভায় 'বঙ্গবন্ধু' খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ পল্টনের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে তাঁকে 'জাতির পিতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। সেই থেকে বাঙালির যুগপৎ 'বঙ্গবন্ধু' এবং 'জাতির পিতা' হয়ে ওঠেন তিনি।

হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত একটি জাতির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিকেও তিনি নিজ কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় সম্পন্ন করে গিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বাঙালি জাতিকে তিনি জাতিসংঘের বিভিন্ন জাতিসত্তার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে যান। আর এই তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ স্বপ্নপূরণ ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাঙালি জাতির।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে এসেছিলেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি। এটা ছিল মৃত্যুর মুখ থেকে তাঁর দ্বিতীয়বার ফিরে আসা। জনগণের ভালোবাসায় তিনি সেদিন আবেগে ছিলেন উদ্বেলিত। লক্ষ-কোটি বাঙালির সামনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন :

ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা রেখেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যখন

একদল হিংস্রপ্রবর হায়েনা বাঙালির এই কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিচ্ছিল, তখনো তিনি তাঁর বাঙালিত্বের চেতনা থেকে একচুলও নড়েননি। অনেক সময়ই বক্তৃতা-বিবৃতিতে তিনি বলতেন, 'বুকের রক্ত দিয়ে হলেও জনগণের ভালোবাসার মূল্য পরিশোধ করে যাব'।

এরকম অনেক বাক্য তিনি বলতেন। জনগণকে খুব ভালোবাসতেন। জনগণের ওপর থেকে তিনি কখনো বিশ্বাস হারাননি। তাই প্রায়ই বলতেন, 'মাই পিপল, আমার জনগণ'। দেশে-বিদেশে কোনো ব্যক্তি বা দেশকে তিনি কখনোই ভয় পেতেন না। তিনি বলতেন, 'শেখ মুজিব কারো কেনা গোলাম না।' আজীবন মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে এই বাঙালি বীর এভাবে এই জাতিকে তাঁর শাহাদাতের মধ্যদিয়ে মহিমান্বিত করে গিয়েছেন।

বাঙালির ইতিহাসে তাঁর আগমন ছিল তাই অপেক্ষিক, তিনি জন্মগ্রহণ না করলে বাংলা ও বাঙালি জাতির মুক্তির প্রশ্নটি আজও হয়তো অপেক্ষমানই থেকে যেত। বাঙালি জাতির হাজার শোকর, এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো আপোশহীন বাঙালি, যাঁর অমরতার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এই জাতি জেগে উঠেছিল। পৃথিবীর অন্যতম একটি পশুশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে এবং তাঁর নামের বরাতেই যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালে জয়লাভ করেছিল বাঙালি। তাঁর অবদান ও দানের কথা তাই সোনার অক্ষরেই এই জাতির প্রজন্মের-পর-প্রজন্মের হৃদয়ে লেখা থাকবে। কারণ তাঁর প্রিয় জনগণকে তিনি উপহার দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন আবাসভূমি। বাঙালি একটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী জাতি হলেও বঙ্গবন্ধুর হাতেই তার প্রথম আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন স্বীকৃতি লাভ ঘটে।

স্বাধীনতার পর এই দেশ ও জাতির প্রতি ছিল তাঁর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি এর অনেক কিছুই করে যেতে পারেননি। যে যোগ্য নেতৃত্বে তিনি এই দেশ ও জাতিকে স্বাধীন করেছিলেন, সেই নেতৃত্ব দ্বারা তাঁর এদেশকে পৃথিবীর এক সুন্দর বাসগৃহ হিসেবে গড়ে তুলে দিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। সেই লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টা ও আগ্রহের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সার্বিক সাফল্য পেতে তাঁর যে সময়ের প্রয়োজন ছিল, সে সময় ও সুযোগ দিতে শত্রুরা ছিল নারাজ।

পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশে তাঁর প্রশাসনের যাত্রা শুরুই হয়েছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি, বিধ্বস্ত অবকাঠামো এবং লাখো মানুষের স্বজন-হারানোর বেদনার কান্না ও রোলের মধ্যদিয়ে। এরপরও মাত্র দুই মাসের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের তিনি তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুনিয়ার সামরিক ইতিহাসে এত দ্রুত বিদেশি সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনা এই প্রথম। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত এককোটি মানুষের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকে করেছিলেন তিনি নির্বিঘ্ন এবং তাদের পুনর্বাসনকে করেছিলেন সমাপ্ত। মাত্র একবছরে জাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধানও তিনি উপহার দিতে পেরেছিলেন। ১৯৭৪ সালেই বঙ্গবন্ধু 'বাংলাদেশ সাহায্যদাতা গোষ্ঠী' গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষকের জমির খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন তিনি এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে জাতীয়করণ করেছিলেন শিক্ষার এই মাধ্যমকে। বিশ্বের কোনো দেশেই বিপ্লব বা মুক্তিযুদ্ধের পরপরই নির্বাচন বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের এক বছরের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক সরকার কাজ শুরু করে। ■

তথ্যসূত্র :

[১] সরদার ফজলুল করিম : '*বাংলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান*', গণমাধ্যম সাময়িকী *নিরীক্ষা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মে-আগস্ট ২০১৪ সংখ্যা থেকে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা ৭-৮।

[২] পাকিস্তান আইন পরিষদের কার্যবিবরণী, ২৫শে আগস্ট ১৯৫৫।

[৩] দৈনিক *ইত্তেফাক*, *আজাদ*, *সংবাদ* : ১০ই মার্চ ১৯৭১।

গল্প

জন্মদিন

আহসান হাবীব

আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। সারা দেশ জুড়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন হচ্ছে। খুব হইচই আর আনন্দ চারিদিকে। সেটাই স্বাভাবিক। মিশুরও আজ মন খুব ভালো। কারণ আজ তারও জন্মদিন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হচ্ছে কেউ তাকে ' হ্যাপি বার্থডে ' পর্যন্ত বলছে না। বাবা-মাও না, একমাত্র বড়ো বোন লিসা আপুও না। মানে কী? আজ সে সাত বছর বয়সে পড়ল। কিন্তু কারও কোনো খবর নেই! আগের জন্মদিনে মা সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলেছিল 'হ্যাপি বার্থডে বাবা'। তারপর বাবা অফিসে যাননি পর্যন্ত। তারা একটা দামি রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিল সবাই মিলে। গিফট তো ছিলই। কিন্তু এবার?

মিশু নাশতার টেবিলে গেল। দেখে লিসা আপু নাশতা খাচ্ছে, চোখের সামনে পেপার ধরা। পেপারে বড়ো বড়ো করে হেডলাইন 'আজ বঙ্গবন্ধুর ১০০তম জন্মদিন'। আর এমন একটি দিনে তার জন্মদিন সবাই একসঙ্গে ভুলে গেল? তাও কী সম্ভব? মা কড়া গলায় বললেন, 'মিশু নাশতা সব খেয়ে শেষ কর', আশ্চর্য তার জন্মদিনে মা এভাবে কথা বলছে! চোখ ফেটে পানি আসার উপক্রম হলো মিশুর। কোনোমতে ডিম-পরোটা খেয়ে ছুটে বের হয়ে গেল মাঠে। আজ স্কুল বন্ধ! মাঠে গিয়ে দেখে রন্টু, মাহিন আর জলি একটা কমিকস বই নিয়ে কীসব আলোচনা করছে। মিশুকে দেখে ওরা কেউ কিছু বলল না। কিন্তু এরা তিনজনই জানে আজ তার জন্মদিন। গত জন্মদিনে ওরা তিনজনে মিলে একটা মজার বই গিফট করেছিল, আর আজ ভুলে গেল!

চল খেলি, বলল মাহিন।
কী খেলবি?
কেন সাতচারা।
ধুর চারজনে সাতচারা জমে নাকি? বলে রন্টু।
আমি খেলব না তোরা খেল। বলে মিশু বাসার দিকে হাঁটা দিল। বরং নিজের ঘরে গিয়ে গল্পের বই পড়া যাক। বাসায় গিয়ে সে হতভম্ব ! বাসার গেটে একটা বড়ো তালা ঝুলছে। সাথে একটা ছোট্ট কাগজে চিঠি। চিঠিতে লেখা।
মিশু,
আমরা তোর ছোটো খালার বাসায় গেলাম।

তুই চলে আয়, দুপুরে ওখানে খাব। তোর ছোটো খালা যেতে বলেছে।

মা

কী আশ্চর্য! এটা খাবার টেবিলে বললেই হতো। এভাবে চিঠি দিয়ে বাসায় তালা মেরে যাওয়ার মানে কী? প্রচণ্ড রাগ উঠল মিশুর। খালার বাসায় তো সে যাবেই না। খালার মেয়ে নাজু সবসময় তার পিছে লাগে। অসহ্য।

পিছন ফিরে দেখে ওরা তিনজনে মিলে সাতচারা খেলা শুরু করেছে। কী আর করা, মিশু ফিরে এসে খেলায় যোগ দিল। খেললে যদি মনটা একটু ভালো হয়। কতক্ষণ খেলেছে ওরা কে জানে। এক সময় জলি বলল সে আর খেলবে না। মাহিন আর রন্টু বলল, তাদেরও বাসায় কাজ আছে। ওরা চলে গেল বল নিয়ে। আর মিশু হাবার মতো দাঁড়িয়ে রইল খালি মাঠে। আজ কিনা তার জন্মদিন!!

এখন কী আর করা। খিদেও লেগেছে। মিশু আস্তে আস্তে হাঁটা দিলো খালার বাসার দিকে। খালার বাসা কাছেই। পনেরো-বিশ মিনিট হাঁটলেই পৌঁছানো যায়।

খালার বাসায় গিয়ে মিশু আবারো হতভম্ব! কেউ নেই। খালাও নেই। ওদের বাসার বুয়া দরজা খুলল।

মা আসেনি?

না তো! আওয়ার কথা নাকি? আমি কইতে পারি না। বহো আইতেও পারে, ক্যামনে কমু?

ছোটো খালা নেই?

কেউ নাই, নাজুরে স্কুল থাইকা আনতে গেছে। বহো পানি খাইবা?

এহ! পানি খাবে! তার জন্মদিন আর সে এখন খালি পানি খাবে। মিশুর ইচ্ছে হচ্ছে টেবিলের উপর খালি গ্লাসটা আছাড় দিয়ে ভাঙে। সে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে সোফায় বসে থাকে খালি বাসায়। ভীষণ অভিমান হয় সবার উপর, তার জন্মদিনের কথা সবাই ভুলে বসে আছে। কোনো মানে হয়?

সোফায় বসে থাকতে থাকতে একটু ঝিমানোর মতো আসে মিশুর। চোখ দুটো যখন একটু লেগে আসে তখনই কারা যেন একসঙ্গে একদম কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠে 'হ্যাপি বার্থডে মিশু!!' মিশু চমকে চোখ খুলে দেখে তার সামনে হাসিমুখে মা দাঁড়িয়ে। তার হাতে বড়ো একটা কেক। মায়ের পাশে বাবা, তার পাশে লিসা আপু, পিছনে ছোটো খালা নাজু, পাড়ার বন্ধু জলি, রন্টু, মাহিন, কেউ বাদ নেই। সবার হাতে একটা করে গিফটের প্যাকেট। সবাই তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। সবার পিছনে বুয়ার মুখটা দেখা যাচ্ছে। তার মুখটাও বেশ হাসি হাসি! ভাবটা এমন কী অভিনয়ই করলাম! ■

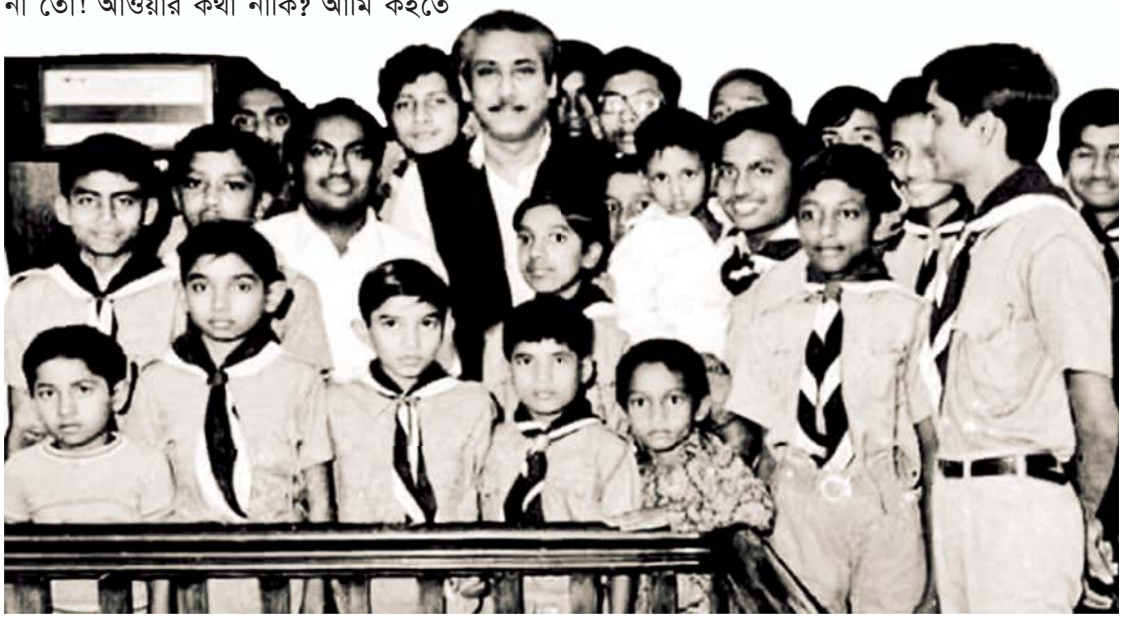

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর

পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন- গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সাথে আমরা আলোচনা করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভুট্টো

বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? জামার (আমার) পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসব? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহিদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' উইদড্রো করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি, প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে

জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু— আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহিদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও- টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়া-নেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইন্‌শাল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

[এখানে মুদ্রিত ভাষণটি ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান’-এর পঞ্চম তফসিল থেকে সংগৃহীত।] ■

নিবন্ধ

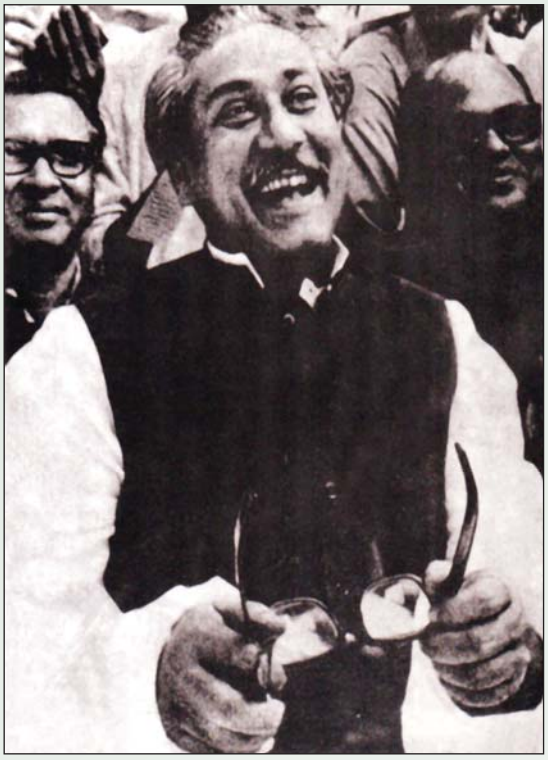

শেখ মুজিব যেভাবে বঙ্গবন্ধু হলেন

কাজী সালমা সুলতানা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ১৭ই মার্চ ১৯২০ সালে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে বঙ্গবন্ধু হলেন? এটা কি হঠাৎ করেই? নাকি মনের খেয়ালে একদিন নিজে নিজে নামের সাথে জুড়ে দিয়ে শেখ মুজিবুর বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন? নাকি এটা তাঁর পারিবারিক খেতাব? বিষয়টি মোটেও সেরকম নয়। অনেক আন্দোলন, অনেক সংগ্রামের পথে হেঁটেছেন তিনি, হয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু'।

তাঁর এই কঠিন পথ চলা দেখে বাঙালি বুঝতে পেরেছিল তিনি এ জাতিকে কতটা ভালোবাসেন, কতটা ভালোবাসেন এ দেশটাকে। এ জাতির জন্য, এ দেশের জন্য তিনি কত কষ্ট স্বীকার করতে পারেন। এ জাতির জন্য শেখ মুজিবুর রহমান জীবনও দিতে পারেন। এমন ভালোবাসা দেখেই বাঙালি জাতি শেখ মুজিবুর রহমান নামের সাথে জুড়ে দিয়েছেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি।

ছোটোবেলা থেকেই চঞ্চল আর দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল। ১৬ বছর বয়সেই তিনি ইংরেজ শাসন বিরোধী হয়ে ওঠেন। সে সময় এদেশটা শাসন করত ইংরেজরা। সুদূর ব্রিটেন থেকে তারা ব্যবসার জন্য এদেশে এসে দেশটাই দখল করে নিয়েছিল। সেই বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি পেতে এ দেশে চলছিল তখন স্বদেশি আন্দোলন। ১৭ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধু স্কুলের হেডমাস্টারের সাথে 'মুসলিম সেবা সমিতি'র কাজে যুক্ত হন। হেডমাস্টার মারা গেলে এই সমিতির ভার নিজে নেন। তিনি এই সমিতির সেক্রেটারি হন। ১৯৩৮ সালে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রী গোপালগঞ্জে আসেন। নেতাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে এ জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। এসময়ে তাঁর বন্ধু মালেককে হিন্দু মহাসভার সুরেন ব্যনার্জীর বাড়িতে আটকে রাখা হয়। বন্ধু মালেককে ছাড়াতে গিয়ে মারামারি বাধিয়ে ফেলেন শেখ মুজিব। এজন্য তাঁকে প্রায় ৭ দিন জেলে থাকতে হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতা গিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে দেখা করে গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগ গঠনের কথা বলেন। এরপর গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করে এবং তিনি এর সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৪১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। থাকতেন বেকার হোস্টেলে। সেসময় ইসলামিয়া কলেজ ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। শেখ মুজিব এখানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি।

ইংরেজরা চলে যাবার পর দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান গঠন হয়। দেশ ভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এ পরিস্থিতিতে ভাষাসহ অন্যান্য বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে ১৯৪৭ সালে কলকাতার সিরাজ-উদ-দৌলা হোটেলে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা বৈঠকে বসেন। শেখ মুজিবুর রহমানও এ বৈঠক আয়োজনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পাঠ করেন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। প্রস্তাবে বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও আইন-আদালতের ভাষা করা এবং সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, সে সিদ্ধান্ত জনগণের ওপর ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারি শেখ মুজিব গঠন করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এদিন হরতাল আহ্বান করা হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটিই প্রথম হরতাল। এই হরতালে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে পুলিশ নির্যাতন ও গ্রেফতার করে। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এটিই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম কারাবরণ। ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের আট দফা চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং শেখ মুজিবসহ ভাষা সৈনিকরা কারামুক্ত হন। পরে পাকিস্তানের গর্ভনর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্সে বলেন, উর্দু হবে এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। এর প্রতিবাদ জানান শেখ মুজিব। তারপর ধারাবাহিকভাবে ভাষা আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ নাম না জানা শহিদরা বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেন।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে তাসখন্দ চুক্তিকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবিতে বিরোধী দলীয় নেতাদের নিয়ে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে সকল বিরোধী দলের একটি নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করেন আইয়ুব খান। সেই সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ 'ছয় দফা' ঘোষণা করেন। শুরু হয় বাঙালির স্বাধিকারের আন্দোলন। এর আগে ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় যুক্তফ্রন্টের কাছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ১৯৫৮ সালে উৎখাত করে আইয়ুব খান পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করে। শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ছয় দফা সেদিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মেনে নেয়নি।

ছয় দফা ঘোষণার পর শুরু হয় বাঙালির আসল পথে যাত্রা। চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান, ঢাকার পল্টন ময়দান, মানিকগঞ্জ, সিলেট, ময়মনসিংহসহ সারা দেশে চলতে থাকে ছয় দফার প্রচার। ৩৫ দিনে ৩২টি জনসভায় ছয় দফার পক্ষে বক্তৃতা করেন শেখ মুজিব। আন্দোলনের তীব্রতায় ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দেওয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে। এ মামলা আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। কিন্তু ফল হয় উলটো। জনগণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাদের প্রিয় নেতার গ্রেফতারে। ১৯৬৯ সালের ২১শে জানুয়ারি আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক গণসংবর্ধনায় ছাত্র-জনতার পক্ষে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমেদ এ খেতাব ঘোষণা করেন। এভাবেই গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু' হলেন। বঙ্গবন্ধু উপাধি পেয়ে জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছেন 'স্বাধীনতা'। একটি জাতির মুক্তির জন্য দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম করে স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন তিনি। তাই তো তিনি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শততম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি রইল আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ■

নিবন্ধ

২৫শে মার্চের কালরাত

তাহমিনা কুরায়েশি

সামারা আর টিয়ারা যখন ছিল একেবারে ছোট্টটি তখন তো মামণি আর দিদার আঁচলেই কেটেছে ওদের দিনমান। শুনেছে মিষ্টি মিষ্টি ছড়া আর রূপকথার গল্প। যত বড়ো হচ্ছে ততই চাহিদার পরিবর্তন হচ্ছে। এখন দাদুর কাছে গল্প শুনতেই বেশি পছন্দ করে। দাদুর গল্প তো গল্প নয়, বাস্তব ঘটনা। তাই ওদেরও উৎসাহ দারুণ। আজকের ব্যাপারটা আলাদা। আজ ওরা দিদাকে চেপে ধরেছে। দিদার জীবনে যা ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তাই শুনবে। দিদার আজ ভারী অভিমান হলো। তিনি তার নাতনিদের বললেন- আমার গল্প কি তোমাদের পছন্দ হবে? দাদুর কাছেই তো মজার মজার গল্প শোনো তোমরা। তাই তো আমি আর তোমাদের মধ্যে নাক গলাই না। সামারা টিয়ারা অভিমানী দিদার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে, তুমি তো আজকাল ভীষণ ব্যস্ত থাকো, তাই পাই না তোমাকে। রাগ করো না দিদা। বলো সেই দিনের কথা। ১৯৭১-এ তোমার দেখা সেই ঘটনা। দিদা বললেন- ও আচ্ছা, তাই বলো। আমি ভাবলাম তোমরা তো পেন্টিয়াম যুগের ছেলে-মেয়ে। আমার গল্প কি আর এখন পছন্দ হবে? হ্যারি পটার, রুপানঞ্জেল, স্লিপিং বিউটি, স্নো হোয়াইট আরো কী কী মুভি দেখো, গল্প পড়ো তাই আর কি! সামারা দিদার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে- না দিদা, ঐ সব গল্প না। এখন শুনব তোমার দেখা মুক্তিযুদ্ধের ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা। বুঝেছ? দিদা তো মহা খুশি সামারার কথায়। বললেন- ও, তাহলে তো ঠিক আছে। ভালোই হলো। এবার দাদুকে ছেড়ে ওরা একেবারে দিদার কোলের কাছে ঘেঁষেই বসল। দিদা তো চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করল - আরে ছাড় ছাড় আমাকে। তোরা দুটিতে মিলে একেবারে অক্টোপাসের মতো করে জড়িয়ে ধরেছিস যে! আমি তো শ্বাস নিতেও পারছি না। দিদার অবস্থা দেখে দাদু তো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। বলল, যাক বাবা বেঁচে গেছি, আজ আমার ছুটি। আজ দিদার ডিউটি। শোনো, আমিও কিন্তু তোমাদের সাথে বসে তোমাদের দিদার গল্প শুনব। তোমার দিদা যেমন তোমাদের সাথে বসে আমার গল্প বলা শোনে। দিদা মুখ বেঁকিয়ে বলেন - তোমার কি আর কোনো কাজ নেই। তুমিও কি ওদের মতো ছোট্টটি হয়ে গেলে? যাও পেপার পড়ো গিয়ে। দাদু মজা করে বলে- পেপার তো আমি চোখ দিয়ে পড়ব। আর আমার কান তো থাকবে খোলা, কানের তো তখন কোনো কাজ নেই। সে যদি শুনতে চায় শুনবে, কী বলো? সামারা টিয়ারা তোমরা কি আমার কানে তালা দিয়ে দিতে পারবে? দাদুর কথায় সামারা টিয়ারা হেসেই কুটিকুটি। দিদাও হাসি চাপতে পারছে না। দিদা বললেন- হয়েছে হয়েছে, তবে শোনো তোমার কানে কেউ তালা দিতে যাবে না।

দিদা এবার আরম্ভ করল সেই ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতের। দিদা বললেন- তোমরা দাদুর কাছে আগেই শুনেছ কেন আমাদের এই যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার হরণ করে চলছিল। পূর্ব পাকিস্তানকে কোণঠাসা কর রেখেছিল। আমাদের ন্যায্য পাওনা আমাদের এ দেশে খরচ না করে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হতো। আস্তে আস্তে বৈষম্য বেড়ে চলল। বিশাল বিপর্যয়ে পড়ল পাকিস্তান নামক দেশটি। বুঝেছ?

সামারা-টিয়ারা আবার দিদার কাছে জানতে চায় কেন দিদা? দিদা ওদের বুঝিয়ে বলেন- সাতসমুদ্র তেরো নদীর দুই পাড়ে দুই ভূখণ্ড কেবল কি ধর্মের মিল বলেই এক করে দেওয়া যায়? দুই দেশের দূরত্ব অনেক। যাদের সাথে আমাদের কোনো ভাবেই মিল নেই। যেমন- ভাষায়, খাওয়াদাওয়া, আচার আচরণ, রীতিনীতি সবকিছুতেই অমিল। কেবল মুসলমান বলেই কি দুটো দেশ একটি রাষ্ট্র হতে পারে?

এরপর ভারত-পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের জন্ম হলো। স্বাধীনতার পর থেকেই বাড়তে থাকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য। সামারা বলে- দিদা, শোনো আমি বলি, এজন্যই একাত্তরের যুদ্ধ হলো। আমরা ঐ দেশ থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ পেলাম। তাই না দিদা? জানি তো, দাদু বলেছেন সেই ইতিহাস। আরো বলেছেন ভাষা আন্দোলন- একুশে ফেব্রুয়ারির কথা। মায়ের ভাষা বাংলা কেড়ে নিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। ভাষার জন্য যুদ্ধ হয়েছে ১৯৫২ সালে শহিদ হয়েছেন রফিক, আবদুল বরকত, আবদুল জব্বার, সালামরা। দিদা সামারার কথা শুনলেন তারপর বললেন- ঠিক কথা বলেছ দিদি ভাই। সেই থেকে আমাদের সাথে ওদের বিরোধ লেগেই থাকল। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলো বিপুল ভোটে। তখন এটি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি। শেখ মুজিব জয়ী হন। বাঙালিদের হাতে দেশ পরিচালনা, ওরা মেনে নিতে তালবাহানা শুরু করল। তখন থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হলো। শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপ্রধান করা হবে তা ওরা মানতে পারছিল না। পশ্চিমাদের ভূট্টো হবে রাষ্ট্রপ্রধান। কীভাবে বাঙালিদের দাবিয়ে রাখা যায় চলল তার তালবাহানা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তিনি হার মানবেন কেন। দেশের মানুষ উনাকে চায়, তাই ভোটে জয়ী হয়েছেন। সামারা টিয়ারা বলে ওঠে –তাই তো দিদা। মানা যায় না।

দিদা এবার বলতে আরম্ভ করলেন সেই ২৫শে মার্চের ভয়াল রাতের কথা। পূর্ববাংলার মানুষ কিছু বোঝার আগেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পনা করে পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করার। তারা সৃষ্টি করে বিশ্বের জঘন্যতম গণহত্যা।

বাংলার মানুষের ওপর তারা নারকীয় নির্যাতন চালায়।পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যেন তাদের নিজেদের

পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত ঢাকা, ২৬শে মার্চ ১৯৭১

অধিকারের কথা আর না বলতে পারে সেই জন্য এই নির্মম গণহত্যা। রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, পিলখানা রাইফেল সদর দপ্তরে ঐ রাতে ওরা আক্রমণ চালায় নির্লজ্জের মতো। সেই রাতেই এ দেশের বহু মানুষকে ওরা মেরেছে। টিয়ারা এতক্ষণে মুখ খুলল। ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল- দিদা ওরা তো খুব খারাপ মানুষ। এভাবে বিনা দোষে আমাদের দেশের মানুষকে হত্যা করেছে। দিদা ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন- ওদের দিলে দয়ামায়া ছিল না ওরা ছিল জালেম অত্যাচারী। সামারা দিদাকে জিজ্ঞেস করল, ঐ রাতে তোমাদের কী অবস্থা হয়েছিল? বলছি শোনো। আমাদের বাসা তো সবুজবাগে। আমি আমার বয়েসি রিনা খালা সাথে নানি বাড়ি ৮২ নং শান্তিনগরে এসেছি দু-দিন আগে। প্রায়ই আমি এই নানি বাড়িতে থাকতাম বড়ো খালার সাথে। বাড়িটা বড়ো রাস্তার পাশে আবার পুলিশ লাইনের কাছে। তখন তো আমাদের কলেজও বন্ধ ছিল। আমিও এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটবে কে জানত। আমরা সন্ধ্যা থেকেই শুনতে পাচ্ছি আলোচনা সফল হলো না, দেশে কারফিউ দিয়ে দেবে। যদি আর্মি নামায় তাহলে কী হতে পারে। আমাদের জল্পনাকল্পনা হচ্ছিল। বাড়ির বড়োরা ভীষণ চিন্তিত ছিল। আমিও বাসায় যেতে পারলাম না, মা-বাবা-বোনদের জন্য চিন্তা হচ্ছিল। এ যুগের মতো তো মোবাইল ছিল না। টিএন্ডটি ফোন কারো বাসায় ছিল, কারো বাসায় ছিল না। খালার বাসায় ছিল। সন্ধ্যায় ফোনে মাকে জানিয়ে দিলেন খালা আমাদের কথা আর তারাও যেন সাবধানে থাকে। কী হয় বলা যায় না। যত রাত বাড়ছে ততই থমথমে চারিদিক, আতঙ্কিত জনপদ যেন। রাত ১১টার দিকে দেখলাম ফোন লাইনে কোনো শব্দ নেই, ডেড করে দিয়েছে। ইলেকট্রিসিটিও বন্ধ করে দিয়েছে। গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল দূর থেকে।

আস্তে আস্তে রাত বাড়ছে সাথে শব্দও বাড়ছে। রাত ১২টার পর শুরু হলো নারকীয় তাণ্ডব। আমরা খাটের নিচে লুকিয়ে থাকলোম। এদিকে মশার কামড় আর কিচকিচ বালিতে বসে থাকা দায়। আতঙ্কে পেটের ভাত সব চাল হয়ে যাচ্ছে।পুরো গা কাঁপছে থরথর করে। দাঁতের সাথে দাঁত কটকট করে যেন বাজছে। ওহ আল্লাহ, এ কি নারকীয় বিভৎস রাত! পাশের বড়ো রাস্তায় ট্রাক, বড়ো লরি যাওয়া-আসার শব্দ, ট্যাঙ্কের গোঁ গোঁ শব্দের সাথে শিকলের ভয়ংকর শব্দে আত্মা একেবারে খাঁচা ছাড়া। তারপর বারুদ-বোমার শব্দে-গন্ধে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। মেশিনগান মোটরের শেল ফেলছে। শব্দের সাথে চারদিকে প্রচণ্ড বজ্র আর উল্কাপাতের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে। অনেকগুলো আতশবাজি একসাথে ফুটালে যেমন প্রচণ্ড শব্দ আর গাঢ় আলোর বিচ্ছুরণ হয় তেমনি দেখা যাচ্ছে জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে। কেউ না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। বারুদের গন্ধ ঘর জুড়ে। পাশে পুলিশ লাইনে যুদ্ধ হয় ওদের সাথে পাকিস্তানি আর্মিদের সাথে যুদ্ধ হয় আমাদের দেশের পুলিশদের। সামারা-টিয়ারা ভয়ে বড়ো বড়ো চোখ করে দিদার কাছে জানতে চায় - দিদা সকাল হলো কখন? দিদা বলেন- আহারে আর সকাল। তখন তো সবে রাত তিনটা। আমরা তো অন্ধকারে, ঘড়ির আলোতে ঘড়ি দেখা। রীতিমতো ব্ল্যাক আউট চারিদিকে।

ব্ল্যাক আউট কী দিদা? সামারা জানতে চাইল। দিদা বলল–কোথাও কোনো আলো জ্বলবে না। ঘরের, রাস্তার, লাইট পোস্টের বাতি- মানে সরকারিভাবেই ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যাতে কেউ কোনো কাজ করতে না পারে। তারপর শোনো কী হলো। আমাদের নানি বাড়িটা বলেছি না পুলিশ লাইনের এবং মেইন রোডের পাশে। আমাদের কী রেহাই আছে? কী আছে কপালে। কেবল আল্লাহ তায়ালার নাম ডাকছি। দোয়া-কলেমা পড়ছি। রাত প্রায় সাড়ে তিনটা হবে তখন। আমাদের বাড়ির বিশাল দুই পাল্লার টিনের গেটে প্রচণ্ড আওয়াজ বুটের এবং রাইফেলের বাটের আর উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি। আমরা ভয়ে একেবার জড়োসড়ো। কী আর করা। আমরা সবাই চুপচাপ। ওদের মতো ওরা বাইরের দরজা ভেঙে ফেলে ভেতরের ঘরেরও দরজায় আবার সেই শব্দ, বুট দিয়ে দরজায় আঘাত। বুট আর রাইফেলের বাটের আঘাতে ঘরের দরজা ভেঙে ৬/৭ জন আর্মি অফিসার সিপাহি ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। চিৎকার করে বলতে লাগল - মিসক্রিএন্ট কাহা মিসক্রিএন্ট ?

বাহার সে কই আয়া? আমরা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিলাম

আর খালা, খালু, ছোটো মামা সামনে এসে দাঁড়িয়ে সুরা পড়তে আরম্ভ করল। বড়ো খালা ভাঙা ভাঙা উর্দুতে–নেহি নেহি কই নেহি আয়া।

ইদার কই নেহি হে। মেরা হাসবেন্ড মেরা ভাই মেরা বাল বাচ্চা লোগ হায়। হাম লোগ তো মুসলমান হ্যায়। খালার কথা কী কিছু বিশ্বাস করল কি না জানি না। পরক্ষণেই খালুর হাত ধরে টান দিয়ে - উনকো লে যায়ে গা। কুছ পুঁছপাঁছকে লিয়ে। সাথে সাথে খালা কান্না জুড়ে দিল বলল - প্লিজ স্যার রেহেম কিজিয়ে। ইয়ে মেরা সাওহর উনকো ছোড় দিজিয়ে। হাম লোগ ইনোসেন্ট, কুছ নেহি জানতা। কী মনে করে খালুর হাত ছেড়ে দিল তারপর হঠাৎ পেয়ে গেল আমাকে। আমি আর আমার ছোটো খালা দুজনেই দরজার কোনার দিকটায় ছিলাম যেন না দেখতে পায়। কীভাবে ওদের নজরে পড়ে গেলাম। একজন সিপাহি আমার হাত ধরে একটা টান দিয়ে সামনে নিয়ে এল। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি হাত ছাড়াতে আর জোড়ে জোড়ে আয়তুল কুরসি পড়ছি। এদিক থেকে খালা আবার আমার জন্য করুণভাবে মিনতি করছেন। প্লিজ স্যার রহম কিজিয়ে। উসকো ছোড় দিজিয়ে। ইয়ে তো আপকা লাড়কি কি তারা। রহম কিজিয়ে। ওদের অফিসারের মনে কী হলো সে সিপাহিকে বলল- উসকো ছোড় দিজিয়ে। সাথে সাথে এক ঝাঁটকায় আমার হাতটা ছেড়ে দিল গজগজ করতে করতে। তখন মনে হলো আল্লাহ তায়ালার রহমত বর্ষণ হলো আয়াতুল কুরসি পাঠে। জীবন যেন ফিরে এল হাতের মুঠোয়। ভুলতে পারিনি এই স্মৃতি বহু বছর। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে থাকতাম অনেক সময়। যদি এরা আবার আসে। আমাদের ধরে নিয়ে যায়, মেরে ফেলে। কত রকম অঘটন হতে পারত। ঐ দিন আমাদের বেঁচে যাওয়াটা সত্যি সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য। কারো বিশ্বাস হবার কথাও নয়। আর্মি অফিসার তার সিপাহিদের নিয়ে বের হয়ে গেল- লেট আস গো বলে। আমাদের আটকে যাওয়া দম যেন আবার ফিরে এল। আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমরা বেঁচে গেছি ২৫শে মার্চের রাতে। ভাবা যায় না। ঐ রাতে কত লক্ষ মানুষ এই নরপিশাচরা মেরেছে তা অগণিত। অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে দিদা তাকাল সামারা-টিয়ারার দিকে। ওদের নাকের জলে চোখের জলে একাকার অবস্থা। দিদার কোলে গিয়ে বসে দিদাকে আদর করছে। দিদার মুখে ভাষা নেই। চোখে জল। ■

মুক্তিযুদ্ধের গল্প

পালিয়ে গেছে পাকিভূত

রফিকুর রশীদ

আমাদের মামাতো ভাইবোন রিটন আর রুপু যে ভীতুর ডিম তা আমি আগেও জানতাম। গ্রামে নানুবাড়ি বেড়াতে গিয়ে তো ওদের খুব কাছ থেকে দেখেছি, খালাতো ভাইবোনগুলো এসেছে, সবার সঙ্গেই প্রাণ খুলে মিশেছি, হইচই আর আড্ডা ইয়ার্কিতে মশগুল থেকেছি। কত যে গুলগপ্প বানিয়ে ঝেড়েছি তার ঠিকঠিকানা নেই। রিটন আর রুপুর মতো এমন ভীতু আর কোথাও দেখিনি। একটা নতুন কথা শুনলেই চোখ উলটে অবাক। চমকে ওঠার ভঙ্গিতে বলে– হায় আল্লাহ! সত্যি বলছ ভাইয়া?

সত্যি না তো কি মিথ্যা? আমার সব কথাই কি তবে ভুল ভেবেছিস?

এভাবে আমি একটু রেগে উঠলে তখন আবার রুপু ঠান্ডা। পোষা বেড়ালের মতো গায়ে হাত বুলিয়ে তোয়াজ করে, কথার মোড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে নিতে চায়, আমার হাতের কড়ে আঙুল ধরে বলে– না না, ভুল হবে কেন? আমি এমনিতেই জানতে চাইছি, টিকটিকির লেজ খসে পড়াটা তুমি তাহলে নিজ

চোখেই দেখেছ?

আমি একটু বিরক্ত হই।

কী মুশকিল, নিজে চোখেই তো দেখতে হয়। অন্যের চোখে দেখা যায় নাকি? আচ্ছা ভাই, আমারই ভুল হয়েছে।

রিটন তখন গা ঝাড়া দিয়ে বলে।

বাব্বা! শুনেই আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! লেজ খসে পড়ল তোমার গায়ে? ততক্ষণে খালাতো ভাই আদিত্য মুঠোর মধ্যে আরশোলা নিয়ে এসে ছেড়ে দেয় রুপুর গায়ে। আর যায় কোথায়! সারা বাড়ি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একশেষ।

আমার ভাইবোনগুলো এই রকম।

সেই পিচ্চিবেলাতেও দেখেছি, এখনো দেখছি। এখন তো আর ওরা ছোটো নেই। রিটন পড়ে সেভেনে, রুপু ক্লাস ফাইভে। থাকে তারা ঢাকায়। চোখমুখ টানটান খোলামেলা। কত রাজ্যের নিত্যনতুন খবর রাখে। ডিটেকটিভ তো বটেই, হরর বই পড়ে, ফিল্ম দেখে। আর সেই মানুষের কিনা ভূতের ভয়।

আমরা মেহেরপুরে আসার পর রিটন, রুপু এই প্রথম বেড়াতে এসেছে আমাদের বাসায়। যশোর এমএম কলেজ থেকে কয়েক মাস আগে বদলি হয়ে এসেছে বাবা, মেহেরপুর সরকারি কলেজে। কলেজ প্রাঙ্গণেই একতলা বাসা। খোলামেলা এবং নিরিবিলি। আমাদের স্কুলটা খানিক দূরে, শহরের মধ্যে। কলেজের কাছাকাছিও আছে একটা স্কুল। রাস্তার পশ্চিমে ভোকেশনালের পাশে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল। স্কুলের নামটা আমার পছন্দ হয়, আমি ভর্তিও হতে চাই ওখানে। কিন্তু আম্মুর খুব আপত্তি।

বেসরকারি স্কুল, ঠিকমতো লেখাপড়া হয় কি না হয়। অবশেষে যশোর জেলা স্কুলের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এসে আমাকে ভর্তি হতে হয় মেহেরপুর মডেল স্কুলে। শুধু আমি নই, আমার ছোটো ভাই নিশাতও পড়ে এই স্কুলে, ক্লাস সিক্সে। রিটন, রুপু আমাদের বাসায় বেড়াতে আসার পর আমাদের স্কুল দেখতে চাইল না। বলল, স্কুল মানেই তো সেই চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ, চক-ডাস্টার, বড়ো বড়ো বিল্ডিং, খেলার মাঠ। তার চেয়ে চলো যাই মুজিবনগরে, স্মৃতিসৌধ দেখে আসি।

এ প্রস্তাব নতুন কিছু নয়। চিঠিতে এবং মোবাইলে রিটন ও রুপুকে এ প্রস্তাব অনেক আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুজিবনগর থেকে ঘুরে আসার পর ওদের দুই ভাইবোনকে যে এভাবে ভূতে পেয়ে বসবে সে কথা কে জানত!

হ্যাঁ, তাই। শিক্ষিত মা-বাবার সন্তান হয়েও ওদের বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে নিকষ কালো অন্ধকার। আর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাস করে বহুদিনের পুরনো ভূত। এ দেশের আনাচে-কানাচে সচরাচর যেসব ঐতিহ্যবাহী ভূতের বাস, এ ভূত আবার মোটেই সে জাতেরও নয়, সে ধাতেরও নয়। মামদো ভূত, গেছো ভূত, পেঁচো ভূত– এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সেই ভূতের। সে ভূতের নাম পাকিভূত। বাইরে থেকে আসা এসব ভূতেরা যে এ দেশের জল-হাওয়ায় আজও কীভাবে টিকে আছে তাই ভেবে আমি আবাক হই।

ঘটনার সূত্রপাত মুজিবনগরেই, স্মৃতিসৌধের পাদদেশে। ছায়াঢাকা বিশাল এক আমবাগানের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধ। উদিত সূর্যের আদলে গড়া। লাল টকটকে সূর্যের রশ্মি বোঝাতে কংক্রিটের তৈরি ২৩টি পিলার দেখিয়ে বাবা আমাদের জানান, পাকিস্তানিদের তেইশ বছরের শাসন-শোষণের প্রতীক এগুলো। কিন্তু সেই শাসন-নির্যাতন-অত্যাচারের শৃঙ্খল ভেঙে বীর বাঙালি একাত্তরে স্বাধীনতা সূর্য ঠিকই ছিনিয়ে এনেছে। ইতিহাসের অধ্যাপক আমার বাবা কী চমৎকার করে বুঝিয়ে বলেন– এই যে এখানে একাত্তরের সতেরোই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে দিতে হঠাৎ আমাদের প্রশ্ন করেন–

দেশ চালাতে হলে তো একটা সরকার থাকা চাই, তাই না?

আমরা সবাই বলি, হ্যাঁ চাই। বাবা বলেন–

তার ওপর আমাদের এই দেশটা তখন পাকিস্তানি সৈন্যদের দখলে। যুদ্ধ করে শত্রু হটিয়ে মুক্ত করতে

আমবাগানের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতিসৌধ। উদিত সূর্যের আদলে গড়া। লাল টকটকে সূর্যের রশ্মি বোঝাতে কংক্রিটের তৈরি ২৩টি পিলার দেখিয়ে বাবা আমাদের জানান, পাকিস্তানিদের তেইশ বছরের শাসন-শোসনের প্রতীক এগুলো...

হবে মাতৃভূমি। সেজন্য সরকার লাগবে না?

আমরা বলি, তা তো লাগবেই।

হ্যাঁ, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত সেই সরকার সেদিন এখানে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে– যেভাবেই হোক এ দেশ স্বাধীন করবেই। তখন এই জায়গাটার নাম ছিল বৈদ্যনাথতলা। সতেরোই এপ্রিল থেকে নতুন নাম হয়ে যায় মুজিবনগর।

এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। আমাদের রিটন-রুপুর কাঁধে তখনো পাকিভূত ওঠেনি। মুজিবনগরের ইতিহাস জানার পর বাবার সঙ্গে আমরা ফিরে আসি মেহেরপুরে। বুঝতে পারিনি বাবার মাথায় সেদিন ইতিহাসের পোকা কিলবিল করছে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাবা সেদিন বিকেলে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং মেহেরপুর কলেজ ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে জানান– একাত্তরে এই তিন জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প। কত নিরীহ মানুষকে যে এসব ক্যাম্পে ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করে হত্যা করেছে, কত মা-বোনকে ধরে এনে বেইজ্জতি করেছে তার সঠিক কোনো হিসাব-নিকাশ নেই। স্বাধীনতার পরও অনেকদিন সেসব অসহায় মানুষের কান্না শোনা গেছে এই এলাকায়। রিটন হঠাৎ প্রশ্ন করে–

তারা কি তখনো জীবিত ছিল?

পাগল ছেলে। পাকসেনারা কাউকে বাঁচিয়ে রেখেছে?

আমাদের সবারই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। আমরা একে অপরের দিকে তাকাতেও পারি না। রুপুর চোখ ভরা অশ্রু দানা গড়িয়ে পড়ল বলে। আমারও ভাবনা হয়, স্বাধীনতার জন্য কত মানুষ জীবন দিয়েছে সেই হিসাবটাও আমরা জানি না ঠিকঠাক। বাবা হঠাৎ আমার এবং রিটনের কাঁধে হাত দিয়ে জানতে চান, বধ্যভূমি কাকে বলে জানো তোমরা?

আমাদের মুখে কথা নেই। শব্দটি আমার অচেনা নয়, অনেক সময় শুনেছি বটে, তবে ঠিক অর্থ জানা হয়নি। রিটন মুখ নামিয়ে নেয়। তখন বাবা একেবারে স্কুলের মাস্টারের মতো করে উচ্চারণ করেন–

যে ভূমিতে বধ করা হয় তাহাই বধ্যভূমি। বধ মানে?

নিজেই জবাব দেন, হত্যা, হত্যা। পরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আঙুল উঁচিয়ে দেখান– কলেজের পেছনের এই সবটাই আসলে বধ্যভূমি। সেই একাত্তরে এ সবই ছিল ফাঁকা, মানে বিরান মাঠ। এখানে পাকিস্তানি জানোয়াররা নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে নির্বিচারে। তাদের কারো দাফন হয়নি, জানাজা হয়নি; কবরও দেওয়া হয়নি ঠিকমতো। ভাবতে পারো মানুষের এ কী অপমান?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে প্রায়। বাবার চেহারায় পড়েছে অপমানের ছায়া। মুখে কথা নেই, আমরা সবাই নির্বাক হেঁটে চলি বাবার পিছে পিছে। যেতে যেতে পোস্ট অফিসের কোনায় পেট্রোল পাম্পের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বাবা। ধীর পায়ে আরো একটু এগিয়ে যান সামনে, ডানে। আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। শ্বেতশুভ্র এক স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এসে বাবা আহ্বান জানান, এসো, মাথা নোয়াই। মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাই–

আমি মাথা নোয়াই। মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাই। আমি জিজ্ঞেস করি, কাকে শ্রদ্ধা জানাবো বাবা?

নাম না জানা অসংখ্য শহিদের দেহাবশেষ, হাড়গোড়, মাথার খুলি কুড়িয়ে এনে এখানে গণকবর দেওয়া হয় বিজয়ের পর। এসো, সেই অজানা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। বাসায় ফেরার পথে আমি বাবাকে শুধাই, তুমি এত কথা জানলে কী করে বাবা? বাবার সহজ উত্তর– ইতিহাসের ছাত্র যে! আপন জাতির ইতিহাস না জানলে কি চলে? একটুখানি হাত বাড়ালেই সব পাওয়া যায়। এরপর আমরা পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে যখন বাসায় পৌঁছি তখন চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গরমও পড়ছে বেশ। বাইরে বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে আবারও শুরু হয় গল্পগুজব। বাবা বলেন, মেহেরপুরে বদলির খবরে তাঁরও প্রথমে মন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হয় ভালোই হয়েছে, ইতিহাসের জীবন্ত জাদুঘরে আসা হয়েছে।

রিটন বলে, তা ঠিক। কিন্তু আপনার এই জাদুঘরে তো পাকসেনা নেই।

কে বলে নেই? বাবা যেন একটু তেতে ওঠেন। এবার এক নিমেষেই ঠান্ডা গলায় জানান– আছে আছে। পাকসেনাদের প্রেতাত্মা এখনো এখানে আছে। একাত্তরে যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, আণ্ডা-বাচ্চা মিলিয়ে এখন তাদের সংখ্যা অনেক। আর তাদের সবার কাঁধেই ঠ্যাং দোলাচ্ছে পাকিভূত। পাকিভূত?

হ্যাঁ, এই বাংলাদেশেও আছে সেসব পাকিস্তানি ভূত। ওরা সুযোগ পেলেই দাঁত ভেংচিয়ে হাসে হি হি। আবার বেকায়দায় পড়লে চোখে থুথু দিয়ে মায়াকান্নাও কাঁদে। মোট কথা ওরা বোল পালটানোর ওস্তাদ।

এ সময় বারান্দার সামনে বাতাবি নেবু গাছের ঝাঁকড়া মাথা হঠাৎ যেন একটুখানি কেঁপে ওঠে, শোঁ শোঁ করে হাওয়া বয়ে যায়, রুপুর পায়ের কাছে মিউ করে ডেকে ওঠে কালো ভুতুড়ে এক বেড়ালের ছানা, আর তখনই রিটন চেঁচিয়ে উঠে– ভূত! ভূত! ওই যে নেবু গাছের ডালে ঠ্যাং দোলাচ্ছে ভূত।

দ্রুত থতোমতো খায় রুপু। চোখমুখ উলটে সে জিজ্ঞেস করে, ওটা কি পাকিভূত ভাইয়া?

রুপুর কণ্ঠে পাকিভূত শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। কিন্তু রিটন বলে, ওরে বাবা! আমার তো সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

আমি শুধাই– তার মানে তুই ভয় পাচ্ছিস, এ্যাঁ?

বাবা এবার উঠে দাঁড়ান। সবাইকে আহ্বান জানান, ওঠো সবাই। বাসার ভেতরে চলো। শোনো, পাকিভূতে ভয় পেলে কিন্তু চলবে না। ভয় পেলেই কাঁধে উঠে নাচবে ধেই ধেই।

বাবার এত সাবধান বাণী উচ্চারণের পরও মাঝরাতে হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠে রুপু বলে– ভূত! ভূত! ভূত!

ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে আমি ধমকাই–

কোথায় ভূত?

রুপু বলে– ওই জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাকিয়ে দেখি জানালা বন্ধ। কী দেখতে কী দেখেছে তার ঠিক নেই। আমি আবারও ধমক দেই, ভূত কোথায়, এ্যাঁ? ঘুমো দেখি।

রুপু কাঁপছে। ভয়ে ভয়ে বলে, না ভাইয়া আমি সত্যিই ভূত দেখেছি।

এতক্ষণে রিটন শুধায়, সে ভূত দেখতে কেমন?

রুপু জবাব দেয়– খুবই ভয়ংকর।

আহা, চেহারাটা কেমন?

মানুষের মতোই। তবে তার কপালে চাঁদতারা আঁকা আছে।

আমি আর রিটন এক সঙ্গে বলে উঠি, তাহলে ওটা নিশ্চয়ই পাকিভূত। এবার আমাদের মামি এ ঘরে এসে আমাদের মাঝখানে বসেন। সবাইকে আদর করে দেন। তারপর বলেন, সারারাত কি এরকম ভূতের কেচ্ছাই চলবে?

রুপু তখনো গোঁয়ার্তুমি করে, কেচ্ছা নয় মা, সত্যি আমি ভূত দেখেছি। মামি উঠে বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেন। তারপর শুধান, কোথায় ভূত? আমরা সবাই বলি– পাকিভূত পালিয়ে গেছে। ■

স্মৃতিকথা

বঙ্গবন্ধু ও দেওয়ান চাচা

স.ম. শামসুল আলম

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি হেলিকপটার এসে নামল। গোয়ালন্দ মহকুমার খানখানাপুরে। সুরাজ মোহিনী ইনস্টিটিউটের মাঠে। এই ইনস্টিটিউট খুব ঐতিহ্যবাহী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত। হেলিকপটার নামতে দেখে এলাকার সবাই অবাক। যে যেভাবে পারল ছুটে এল মাঠে। কারো গায়ে গেঞ্জি, কারো শুধু একটি গামছা। সবার পরনেই লুঙ্গি। বাচ্চাদের কেউ কেউ সম্পূর্ণ উদোম। কেউবা একটি হাফপ্যান্ট পড়া। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লোক উপস্থিত হলো। বঙ্গবন্ধু হেলিকপটার থেকে নেমে লোকজনের কাছে এলেন। বঙ্গবন্ধু তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বললেন, এইখানে গুর্ণিঝড় কোনে অইছে?

গুর্ণিঝড় কোথায় হয়েছে কেউ জানে না। একজন বলল, এই দিকে কোনু গুর্ণিঝড় অয় নাই।

বঙ্গবন্ধু অবাক। তিনি ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দেখতে এসেছেন। অথচ এখানে কোনো ঘূর্ণিঝড়ই হয়নি। একজন প্রধানমন্ত্রী একটি ঘূর্ণিঝড় এলাকা পরিদর্শন করতে বের হয়েছেন। এটি চাট্টিখানি কথা না। সাধারণ মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর যে দরদ তা সবাই জানে।

বঙ্গবন্ধু তখন দেওয়ানকে খুঁজতে লাগলেন। দেওয়ান মানে দেওয়ান জালাল উদ্দিন। বঙ্গবন্ধু একজনকে বললেন, এইখানে দেওয়ান জালাল উদ্দিনের বাড়িটা কোনখানে?

লোকটি বলল, দেওয়ানের বাড়ি তো আরো দুই মাইল দূরে। কৃষ্ণপুর। হাঁ-টি যাওয়া লাগবি।

বঙ্গবন্ধু বললেন, সেইখানেই তো কাল গুর্ণিঝড় অয়ছে?

: না এইদিক কোনু গুর্ণিঝড় অয় নাই।

আসল ঘটনা পরে জানা গেল। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন জানালো, ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ফরিদপুরের হাটকেষ্টপুর। কোথায় কৃষ্ণপুর আর কোথায় কেষ্টপুর। বঙ্গবন্ধুর মাথায় এসেছে কৃষ্ণপুর। কেষ্টপুরকে তিনি কৃষ্ণপুর ভেবেছেন। কেননা, কৃষ্ণপুর গ্রামটি তাঁর মনে গেথে আছে। কৃষ্ণপুরে যে দেওয়ান জালাল উদ্দিনের বাড়ি। বঙ্গবন্ধু আর দেরি করলেন না। দ্রুত তাঁকে হাটকেষ্টপুর যেতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের স্বচক্ষে দেখতে হবে। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি গিয়ে হেলিকপটারে উঠলেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকা লোকটি হাটকেষ্টপুর নোট করে নিয়েছেন। যে লোকটি ঘূর্ণিঝড় এলাকার নাম বলেছিল, তাকে ধন্যবাদ দিতে ভুললেন না তিনি।

সুরাজ মোহিনী ইনস্টিটিউটের আশপাশের লোকজন কিছুই বুঝতে পারল না। বঙ্গবন্ধু, যিনি আমাদের জাতির পিতা, তিনি কেন দেওয়ানকে খোঁজ করলেন। কেনই বা হাটকেষ্টপুরের বদলে কৃষ্ণপুর গ্রাম খুঁজেছেন। ঐ ঘটনার এক বছর পর বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। আমরা তখন ছোটো। বুঝতাম না। আমি, কাশেম আলী, আব্দুল হাই, জয়নাল মণ্ডলসহ আরো কয়েকজন। আমরা দেওয়ান চাচার কাছে গিয়ে বসতাম। দেওয়ান চাচা আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর জীবনী শুনিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু দেওয়ান চাচাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁরা ছোটোবেলায় একসাথে পড়ালেখা করেছেন। দেওয়ান চাচার এক চাচা গোপালগঞ্জে চাকরি করতেন। সেই সূত্রে দেওয়ান চাচা ওখানে থেকে পড়ালেখা করতেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে ডাকতেন মুজিব বলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁকে শুধু 'মুজিব' বলে ডাকার কথা শুনে আমরা হাসতাম। কিন্তু দুঃখ পেতাম বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার ঘটনা শুনে। বঙ্গবন্ধু এর আগেও খানখানাপুর এসেছেন। এখানে ফুটবল খেলার বড়ো আয়োজন হতো। সেই খেলার নামকরণ ছিল রামকানাই কুণ্ডের শিল্ড। রামকানাই কুণ্ডের শিল্ড ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। তিনি খেলাধুলা খুব পছন্দ করতেন। তাই বন্ধু দেওয়ান জালাল উদ্দিনের আমন্ত্রণে খেলা দেখতে এসেছিলেন। তখন প্রায় সব এলাকাতেই ফুটবল খেলার বড়ো বড়ো আয়োজন হতো। ক্রিকেটের তেমন প্রচলন ছিল না। বঙ্গবন্ধু এই খেলা দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

১৯৭০ সালে নির্বাচনি প্রচারণার জন্য একবার রাজবাড়ি এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দেওয়ান চাচার সাথে কথা হয়নি বলে চাচা অভিমান করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর ওপর। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তো তখন সারা দেশের নির্বাচন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। কীভাবে পাকিস্তানের শত্রু তাড়ানো যায়, কীভাবে আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করব। এসব নিয়ে সারা দেশে তিনি দৌড়িয়ে বেড়িয়েছেন। ছুটেছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সেবার রাজবাড়ি এসে বঙ্গবন্ধু মঞ্চে উঠে বললেন, আমি রোজা আছি, বেশি কথা বলব না। আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দেবেন।

এই বলে তিনি রাজবাড়ির দুজন প্রার্থী– কাজী হেদায়েত হোসেন ও এবিএম নূরুল ইসলামকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর দু'পাশে দুজনকে দাঁড় করিয়ে হাত উঁচু করে ধরলেন। এরপর মঞ্চ থেকে নেমে চলে গেলেন। সেদিন দেওয়ানকে খোঁজেননি বলে দেওয়ান চাচা মনে কষ্ট পেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সেই একটি বাক্য শুনেই জনগণ নৌকায় ভোট দিয়েছে। দুজন প্রার্থীই জয়লাভ করেছে। এভাবে সারা দেশে প্রায় সবাই নৌকা প্রতীক নিয়ে জয়ী হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে দেশের মানুষ এতটাই ভালোবাসত যে তাঁর একটি কথাই যথেষ্ট। যখন তিনি ৭ই মার্চের ভাষণে বললেন, তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকবে, শত্রুর মোকাবিলা করবে। জনগণ তাই করেছে। মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু অনেক চিঠি লিখেছেন দেওয়ান চাচাকে। দেওয়ান চাচাও তাঁকে লিখেছেন।

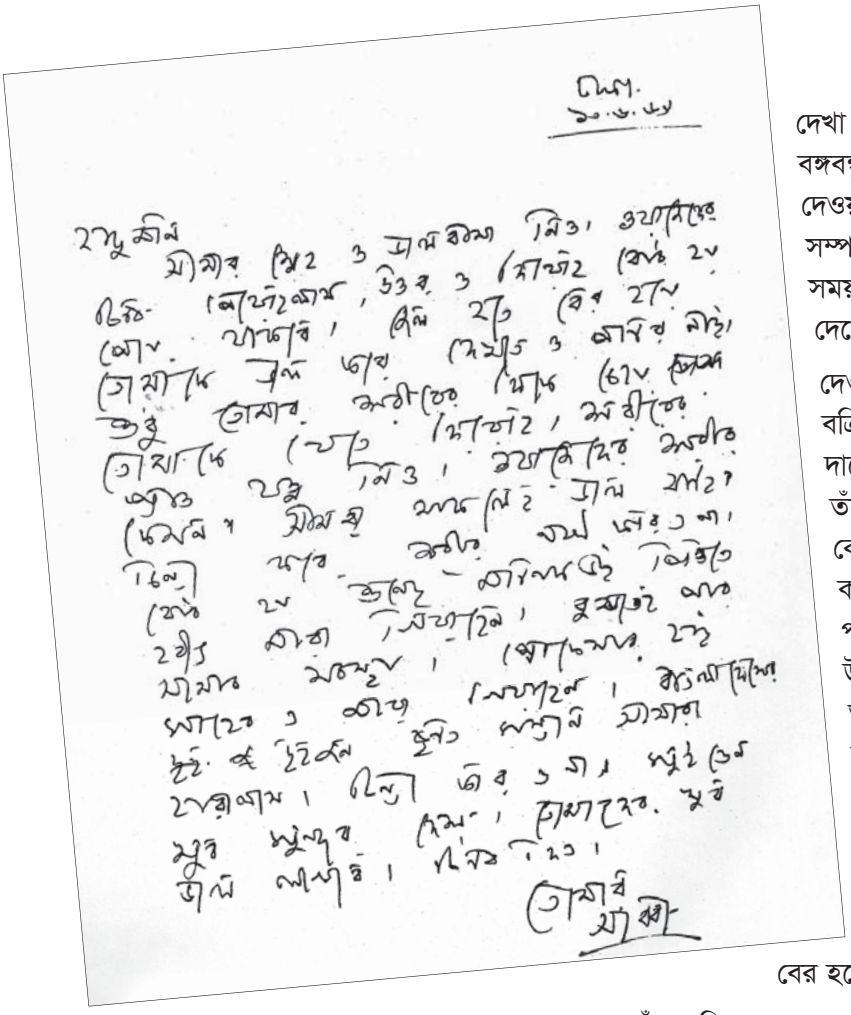

তখন চিঠি ছিল যোগাযোগের সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। বলা যায় একমাত্র মাধ্যম। জরুরি প্রয়োজনে অবশ্য টেলিগ্রাম প্রচলন ছিল। আমরা দেওয়ান চাচাকে প্রশ্ন করেছি, সেই চিঠিগুলো কোথায়?

দেওয়ান চাচা বললেন, খুবই যত্ন করে রাখছিলাম, কিন্তু উইপোকায় কাইটা ফেলাইছে।

দেওয়ান চাচার টিনের ঘরের বেড়াটা অবশ্য মুলিবাঁশের। মুলিবাঁশ পুরনো হলে সহজেই ঘুণ ধরে। কোন ফাঁকে ঘুণ বঙ্গবন্ধুর হাতে-লেখা চিঠিগুলো কেটেছে, দেওয়ান চাচা টের পাননি। এটা নিয়ে তাঁর আক্ষেপের শেষ ছিল না।

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার কিছুদিন আগে দেওয়ান চাচা তাঁর সাথে দেখা করেন। দেওয়ান চাচার আগ্রহ ছিল একটি কথা জানতে। কেন বাড়ির কাছে গিয়েও সেদিন দেখা না করে ফিরে গিয়েছিলেন? বঙ্গবন্ধু তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। দেওয়ান চাচা তো রাষ্ট্রপতির কাজ সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। সব সময়ই বঙ্গবন্ধুকে বন্ধু হিসেবেই দেখেছেন।

দেওয়ান চাচা ঢাকায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বত্রিশ নম্বর বাড়িতে যান। কিন্তু দারোয়ান ও দেহরক্ষীরা কিছুতেই তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। কোনোভাবে ঠেলেঠুলে জবরদস্তি করে বাড়ির উঠোন পর্যন্ত যেতে পারলেন। দেওয়ান চাচা বেশ উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলেন, আমি তাঁর সাথে দেখা না কইরে যাব না। তোমরা তাঁরে খবর দাও– কৃষ্ণপুরের দেওয়ান আইছে।

দেহরক্ষীরাও উচ্চৈঃস্বরে বলছিল, তিনি এখন বাইরে বের হবেন, দেখা করা সম্ভব নয়।

চেঁচামেচি শুনে বঙ্গবন্ধু ঘর থেকে বারান্দায় এলেন। দেখলেন দুই পক্ষের তুমুল ঠেলাঠেলি চলছে। তিনি দেওয়ান চাচাকে চিনতে পেরে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও, দেওয়ান আমার বন্ধু।

দেওয়ান চাচা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। এতদিন পর, দেশের রাষ্ট্রপতি পদে থেকেও দেওয়ান চাচাকে চিনতে পেরেছেন তিনি। এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। দেওয়ান চাচা যে প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা আর করা হলো না। বঙ্গবন্ধুই বরং তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। খানখানাপুরে পাটের এখন উৎপাদন কেমন হয়? পাটের আড়তগুলো ভালো চলছে তো? পাট হইল আমাদের সোনালি আঁশ। বুঝলা দেওয়ান, এই সোনালি আঁশ হইল আশা-ভরসা। ধানের ফলন কি আগের মতো হয়? কৃষকরা ন্যায্য দাম পায় তো? ইত্যাদি।

দেওয়ান চাচা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধুর দিকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর গায়ে টোকা দিয়ে বললেন, কী হইল দেওয়ান জালাল উদ্দিন, ধ্যানে বসলা নাকি?

'এই হইল আমার বন্ধু, আমাদের বঙ্গবন্ধু'– দেওয়ান চাচা কথার মাঝে একটু থামেন। কখনো তিনি হাসেন, কখনো চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। আমরা দেওয়ান চাচার কাছ থেকে শোনা গল্প আমাদের ছেলে মেয়েকে বলেছি। কৃষ্ণপুরের সবাই জানে দেওয়ান জালাল উদ্দিন বঙ্গবন্ধুর কত আপন ছিলেন। কত কাছের মানুষ ছিলেন। আমরা বলি, বঙ্গবন্ধুর কাছে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই ছিলেন দেওয়ান জালাল উদ্দিন। কারণ প্রতিটি মানুষকেই বঙ্গবন্ধু সমান ভালোবাসতেন।

১৯৯৪ সালে দেওয়ান চাচা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কিন্তু তিনি একটি উদাহরণ রেখে গেছেন। ১৯৭৫ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনো আমিষ জাতীয় খাবার খাননি। এর পেছনে একটি কারণ ছিল। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন এই খবর শোনার পর তিনি পাগলের মতো আচরণ করতে থাকেন। পানিটুকু স্পর্শ করবেন না। না খেয়ে নিজেকে তিলে তিলে শেষ করবেন। এমন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে গ্রামের সকল মুরুব্বিরা তাঁকে বুঝালেন। দেওয়ান চাচার মৃত্যু হলেও বঙ্গবন্ধু তো ফিরে আসবেন না। তিনি এখন সব অনশনের বাইরে। তিনি এখন সব অন্দোলনের বাইরে। তাঁকে নিয়ে কোনো অন্দোলনের সুযোগ নেই। বঙ্গবন্ধু কোনোদিন ফিরে আসতে পারবেন না।

এরপর দেওয়ান চাচা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি আর আমিষ জাতীয় খাবার খাবেন না। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন।

আরো অনেক পরের কথা।

আমার ছেলে মুহিবুর রাসেল তখন হাই স্কুলে পড়ে। এর মধ্যে কয়েকবার সরকার বদল হয়েছে। কোনো কোনো সরকার বঙ্গবন্ধুকে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে। একদিন আমি আমার ছেলেকে বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছি। দেওয়ান চাচার কথা বলেছি। এটাও বলেছি, বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলে রাসেলের নামে ওর নাম রেখেছি। রাসেল আমার সমবয়সি ছিল। আমি রাসেলকে ভুলতে পারি না। যখন তাকে হত্যার জন্য ধরা হয় তখন সে কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল। হত্যাকারী পাষণ্ডরা তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গুলি করে মেরেছিল। এই কষ্ট আমি কোনোদিন ভুলতে পারি না।

দেখলাম রাসেলের চোখে পানি। এক রাসেলের কথা শুনে আরেক কিশোর রাসেল কাঁদছে। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। রাসেল বলল, বাবা আমি একটি কাজ করতে চাই।

আমি বললাম, কী কাজ? ভালো কাজ হলে অবশ্যই সহযোগিতা করব।

রাসেল একটুক্ষণ ভেবে বলল, পরে বলব। দেওয়ান দাদুর জন্য কিছু একটা করতে চাই।

কিছুদিন পর রাসেল এসে আমার পাশে বসল। বললাম, কিছু বলবি?

রাসেল আমার ডান হাতটা টেনে নিল। আঙুল দিয়ে আদর করতে লাগল। এ রকম অভ্যাস ওর কখনো দেখিনি। ধীরে ধীরে বলল, বাবা কাজটা অনেক দূর এগিয়েছে।

বললাম, কী কাজ?

রাসেল বলল, কেন, তোমাকে বলেছিলাম না দেওয়ান দাদুর জন্য কিছু করব?

আমি তো অবাক ওর কথা শুনে। রাসেলরা কয়েকজন বন্ধু মিলে দেওয়ান চাচার কবর খুঁজে বের করেছে। বাঁশের বাতা বানিয়ে নিজেরাই কবরটি ঘিরেছে। আমি ওর সাথে দেওয়ান চাচার বাড়ির পাশে জঙ্গলে গেলাম। দেখি সেখানে একটি সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। রূপবান শিটের সাইনবোর্ডে কালোর ওপরে সাদা অক্ষরে লিখেছে, 'বঙ্গবন্ধুর বন্ধু দেওয়ান জালাল উদ্দিন এই মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই রাসেল বলল, বাবা আরো কাজ হবে। দেখতে পাবে। আমরা বন্ধুরা মিলে ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হাই মাস্টারের সাথে দেখা করেছি। তিনি বলেছেন কোনো একটি

ফান্ড জোগাড় করে কবরটি পাকা করে দিবেন। তখন এই শিটের সাইনবোর্ড থাকবে না। শ্বেতপাথরে এই কথাগুলো লেখা থাকবে।

আমার চোখে জল চলে এল। বললাম, তোদের মাথায় এত বুদ্ধি আগে জানতাম না। কিন্তু যে কথা লিখেছিস তা ঠিক আছে তো? কারণ বঙ্গবন্ধুর বন্ধু তো একজনই নয়।

রাসেল জবাব দিল, তা ঠিক বাবা। বঙ্গবন্ধু বলতেই তো বাংলাদেশের সবার বন্ধু বোঝায়। তারপর আমরা 'এখানে' না লিখে 'এই মাটিতে' লিখেছি। তার মানে বাংলাদেশের মাটিতে যারা বিচরণ করেছেন সবাইকে বুঝিয়েছি।

আমি আরো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, এই বুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি কেন? তাহলে অনেক আগেই দেওয়ান চাচাকে অর্থাৎ পুরো বাঙালি জাতিকে সম্মান জানানো যেত।

রাসেল বলল, সবসময় সবার মাথায় সব বুদ্ধি আসবে এমন কথা নেই বাবা। বাবার মাথায় সব বুদ্ধি থাকলে ছেলেরা কী করবে? মার্কনি-এর বাবা কিন্তু রেডিও আবিষ্কার করতে পারেনি। জেম্‌স ওয়াটের বাবা কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করতে পারেনি। নিউটনের বাবা গতিসূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি।

আমার কান্নামাখা চোখ নিয়ে এবার হেসে ফেললাম। আমরা যা করতে পারিনি, আমাদের সন্তানেরা পারবে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম ঠিকই জানতে পারবে বঙ্গবন্ধুর কথা। জানতে পারবে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাস। রাসেলকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। মনে হলো দেওয়ান চাচা কবর থেকে বলে উঠছেন, এই শান্তির নামই তো বাংলাদেশ। আমার বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

পরদিন রাজবাড়ির স্থানীয় পত্রিকায় রাসেলদের ছবিসহ একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সুরাজ মোহিনী ইনস্টিটিউটের কয়েকজন ছাত্রের মহান উদ্যোগ। তারা কৃষ্ণপুর গ্রামে বঙ্গবন্ধুর বন্ধু দেওয়ান জালাল উদ্দিনের কবর খুঁজে বের করেছে। কবরটি পাকা করার দায়িত্ব নিয়েছেন ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হাই মাস্টার। বাঁশের বাতার কবরের পাশে মধ্যমণি রাসেলের সাথে ওর বন্ধুদেরকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ■

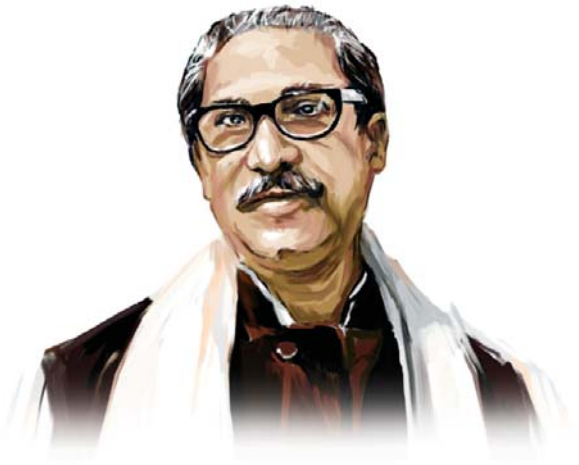

মুজিব মানে

শেখ সালাহ্‌উদ্দীন

মুজিব মানে
শোষণ মুক্তি, শেকল ভাঙার গান
মুজিব মানে
ফিরে পাওয়া লুণ্ঠিত সম্মান।

মুজিব মানে
স্বপ্নভরা মন-পবনের নাও
ঝড়-তুফানে
নিঃসংকোচে মাঝি বাইয়া যাও।

মুজিব মানে
আপোশহীন এক উদ্ধত তর্জনী
সিংহ হৃদয়
এক সে নেতা, জাতির নয়নমণি।

মুজিব মানে
লাল-সবুজের পতাকা অম্লান
মুজিব মানে
বঞ্চিতদের সংগ্রাম অনির্বাণ।

মুজিব মানে
আঁধার শেষে নতুন সূর্যের দিন
মুক্ত স্বদেশ
একটি জাতির জীবন ভাবনাহীন।

মার্চ মুক্তির সূচনা মাস

আলম শামস

ছোট্ট বন্ধুরা। এখন মার্চ মাস। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় সংগ্রামের সূচনা মাস। আর ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এই মাস আমাদের অহংকার, গৌরব ও শৃঙ্খল মুক্তির মাস। ২২শে জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয় এবং সরকারিভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের মানুষের (পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীনতার সংগ্রাম।

২৬শে মার্চ। নতুন ইতিহাসের দিন। বিশ্বের বুকে লাল-সবুজের পতাকা ওড়ানোর দিন। ১৯৭১ সালের এ দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা রক্তে রাঙিয়ে, আত্মত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে একাত্তরের এই দিনে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ দেশের মানুষ। দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন তার চূড়ান্ত পরিণতি। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের সূচনার সেই গৌরব ও অহংকারের মাস-মার্চ।

ভয়াল 'কালরাত্রি'র পোড়া কাঠ, লাশ আর জননীর কান্না নিয়ে রক্তে রাঙা নতুন সূর্য উঠেছিল ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ। সারি সারি স্বজনের লাশ। আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। জ্বলে উঠল মুক্তিকামী মানুষের চোখ, গড়ল প্রতিরোধ। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে ট্যাংকের সামনে এগিয়ে দিলো সাহসী বুক।

আজ থেকে ৪৯ বছর আগের ঠিক এমনি এক ভোররাতে পাক বাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জীবনপণ সশস্ত্র লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বীর বাঙালি। ঘোরতর ওই অমানিশা ভেদ করেই দেশের আকাশে উদিত হয় স্বাধীনতার চিরভাস্বর সূর্য। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই শুরু হয়েছিল একাত্তরের আজকের এই দিনে।

১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বাংলার মানুষের ভোটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার আড়ালে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বাংলার মুক্তকামী মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গভীর রাতে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরীহ জনগণের ওপর হামলা চালায়। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গোলাবর্ষণ করা হয়, নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয় এবং অনেক স্থানে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। এমতাবস্থায় বাঙালিদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। আপামর বাঙালি জনতা পশ্চিম পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

অপারেশন সার্চলাইট ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের পরিকল্পিত গণহত্যা। এই গণহত্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের আদেশে পরিচালিত, যা ১৯৭০-এর নভেম্বরে সংঘটিত অপারেশন বিটজ্-এর পরবর্তী অনুষঙ্গ। অপারেশনটির আসল উদ্দেশ্য ছিল ২৬শে মার্চে মধ্যে সব বড়ো বড়ো শহর দখল করে নেওয়া এবং রাজনৈতিক ও সামরিক বিরোধীদের এক মাসের ভেতর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

মার্চে বাংলাদেশের মাটিতে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা ঘটে যা নয় মাস স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে আমরা বিজয় অর্জন করি। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ■

প্রিয় আমার

এইচ এস সরোয়ারদী

প্রিয় আমার এই বাংলা
প্রিয় বাঁশির সুর,
প্রিয় আমার বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর।

প্রিয় আমার মরমি গান
প্রিয় লালন হাছন,
প্রিয় আমার বঙ্গবন্ধুর
৭'ই মার্চের ভাষণ।

প্রিয় আমার বাংলা ভাষা
প্রিয় মায়ের হাসি,
বঙ্গবন্ধু তোমায় আমি
অনেক ভালোবাসি।

আমার মা

নুসরাত হক

আমার মায়ের মতো এমন মা পৃথিবীতে নাই
তাইতো মাকে আমি হাজার সালাম জানাই।
মা যে আমার লক্ষ্মী সোনা চাঁদের মতো হাসি
তাইতো আমি মাকে অনেক ভালোবাসি।

ছোটোকালে মা যে আমার কত কষ্ট করে
দুধ খাইয়েছেন বাটি ভরে কত আদর করে।
মায়ের ঐ চাঁদমুখে ভুবন ভোলানো হাসি
পৃথিবীতে তাইতো মা আমার সবার চেয়ে দামি।

পৃথিবীতে মা যে আমার সকল ব্যথার সাথি
তাইতো মাকে নিয়েই প্রতিনিয়ত স্বপ্ন এঁকে চলি।
মা যে আমার খোদা তায়ালার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ
তাইতো মা তোমায় পেয়ে ধন্য আমি লক্ষ হাজার বার।

স্মৃতিসৌধ

ইমতিয়াজ সুলতান ইমরান

আজ ২৫শে মার্চ। জয়ের খুব মন খারাপ। ২৫শে মার্চে প্রতি বছরই মন খারাপ থাকে তার। খারাপ থাকারই কথা। এমন দিনে কার না মন খারাপ থাকে। একাত্তরের এই দিনেই ঘুমন্ত বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকি হায়েনারা। রাতের আঁধারে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করেছিল গভীর ঘুমে মগ্ন নিরস্ত্র মানুষের উপর। প্রাণ হারিয়েছিল হাজার-হাজার মা-বাবা, ভাই-বোন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাসহ অবুঝ শিশু।

এবার জয়ের মন আরো বেশি খারাপ। স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্পণ করতে পারবে না। অংশ নিতে পারবে না প্রভাতফেরিতে। কদিন আগে খেলার মাঠে পা ভেঙেছে তার। ডান পায়ের এঙ্কল জয়েন্টে ফ্র্যাকচার। প্লাস্টার করা। ডাক্তারের নির্দেশ, দু-মাস কমপ্লিট বেড রেস্ট।

প্রায় এক মাস ধরে জয় বিছানায়। এক মাস-ই এক বছর মনে হচ্ছে তার। ক্র্যাচে ভর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে ওয়াশ রুমে যায়। ক্র্যাচ ব্যবহারের অভ্যাস আছে তার। গত বছর তাদের কলেজে নাটক হয়েছিল। নাটকে জয় পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার অভিনয় করেছে। পঙ্গুর অভিনয় করতে গিয়ে দীর্ঘ দুই মাস রিহার্সেল করেছিল। শরীরটা যখন বেশি বিষিয়ে ওঠে তখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে একটু হাঁটাহাঁটি করে। শরীরকে একটু নাড়াচাড়া দেয়।

আজ শরীরের সাথে মনটাও বিষিয়ে উঠেছে। ভাবছে, স্মৃতিসৌধে যাওয়া হবে না। কীভাবে শহিদ ভাইদের পুষ্পার্ঘ্য করা যায়? বিছানায় শুয়ে ভাবছে। দু-হাতের আঙুলে প্যাঁচ পাকিয়ে মাথার নিচে রেখে উপর দিকে চেয়ে একমনে ভাবছে। শুধু ভাবছে...।

হঠাৎ বুদ্ধি পেল জয়। বাড়িতেই সে স্মৃতিসৌধ তৈরি করবে। ব্যাস। আর দেরি নয়। অমি, প্রমি, রুহান, ইভানকে ডাকল সে। জয়েরর ডাকে সবাই এসে হাজির। 'জি মামা।' বলল অমি। জয় বলল, আগামীকাল তোমাদের স্কুল বন্ধ না? 'জি মামা বন্ধ। তবে সকালে আমাদের স্কুলে যেতে হবে। কাল নাকি স্কুলে অনুষ্ঠান আছে।'

'কেন বন্ধ? কেন যেতে হবে? কীসের অনুষ্ঠান? তোমরা কী জানো?'

'জানি মামা। কাল মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবসের বন্ধ। তবে স্কুলে যেতে হবে শহিদমিনারে ফুল দিতে। আমরা সবাই প্রভাতফেরি করব। তারপর আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপর চিত্রাঙ্কন, রচনা ও উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা আছে। স্যাররাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুনাবেন। আমাদের স্কুলে কাল কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আসবেন। তাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুনাবেন।'

সবার মুখে এমন কথা শুনে মনে মনে খুব খুশি হলো জয়। কিন্তু মুখটা মলিন করে বলল, 'কাল তোমরা প্রভাতফেরি করবে। শহিদমিনারে ফুল দেবে। আর আমি কিছুই করতে পারব না। আমার মনটা খুব খারাপ লাগছে আজ। খুব কষ্ট পাচ্ছি আমি। আমি একটা

আশা করেছিলাম। তোমরা যদি আমাকে সাহায্য করো আমার ভালো লাগবে।'

'কী সাহায্য মামা?' প্রশ্ন করে অমি। অমিটা এমনই। সুযোগ পেলেই প্রশ্ন করে বসে। এটা কী? সেটা কী? কেন? কীভাবে? এমন কেন? তেমন কেন? তার শুধু জানার ইচ্ছা। ক্লাসে প্রশ্ন করে স্যারকেও মাঝে মাঝে আটকিয়ে দেয়। খুব ভালো ছাত্র। অনেক মেধাবী। জয় একটু বেশি আদর করে ওকে। ছোটোদের মাঝে জানার আগ্রহ থাকা ভালো। যত পড়বে তত শিখবে।

জয় সবাইকে বলল, 'আমি তো বাড়ি থেকে বের হতে পারব না। তাই ভাবছিলাম, তোমরা যদি আমাকে হেল্প কর তাহলে আজ আমরা বাড়িতেই একটা স্মৃতিসৌধ বানাবো। ওখানে আমরা সবাই মিলে রাত বারোটা এক মিনিটে ফুলের তোড়া দেবো। তারপর সকালে তোমরা তোমাদের স্কুলে চলে যাবে।' জয়ের এমন কথা শুনে সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠল। অমি বলল, 'বলুন মামা, আমাদের কী করতে হবে?' জয় ক্র্যাচে ভর দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। বলল, 'এবার যাও। সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে এসো। আমি বাইরে যাচ্ছি। উঠোনে আছি। তোমরা তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

সুন্দর বিকেল। চাতাল জুড়ে মাতাল হাওয়া। কৃষ্ণচূড়ার ডালে বাসন্তী রঙের মেলা। বাড়ির বাগানটি মেতে ওঠেছে নানা রঙের বাসন্তী ফুলে। তোড়া বানাতে ফুলের অভাব হবে না। জয় উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাবছে, কোথায় স্মৃতিসৌধ তৈরি করা যায়? ঘরের পূর্ব দিকের দেয়ালের পাশে অনেক খালি জায়গা। একমাস আগেও এখানে ব্যাডমিন্টন খেলেছে জয়। এখন জায়গাটি খালি পড়ে আছে। বসন্তের বাতাসে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় না। এখানেই তৈরি করা যায় স্মৃতিসৌধ। অমি, প্রমি, রুহান, ইভান এসে হাজির। জয় ক্র্যাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে খালি জায়াগায় এসে দাঁড়ালো। বাম পা মাটিতে। ডান পায়ের ভর ক্র্যাচের উপর। সবাইকে বলল, গোয়াল ঘরের পাশ থেকে ভালো দেখে আস্ত ইট আনতে। অমি, প্রমি, রুহান, ইভান ছুটে গেল ইট আনতে। হাতেহাতে নিয়ে আসা হলো ইট। এবার জয় বলল, ঘরের দেয়াল ঘেঁষে কিছু জায়গায় ইট বিছাতে। ইট বিছানো হলো। জয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছে। সাবধানে কাজ করতে বলল। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তাড়াহুড়ো করলে যে কেউ ব্যথা পেতে পারে। ইটের প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় স্তর। দ্বিতীয়টির উপর তৃতীয়। তৃতীয়ের উপর চতুর্থ। নিচের স্তরটির চেয়ে উপরেরগুলো একটির চেয়ে আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়ে উপরে উঠেছে। নিচ থেকে উপরের স্তরটি পর্যন্ত দেখতে সিঁড়ির মতো দেখাচ্ছে। সবগুলো স্তরই ঘরের দেয়াল ঘেঁষা। দেয়ালে হেলান দিয়ে তিনটি ইটের স্তম্ভ খাঁড়া করা হলো। মাঝেরটি উঁচু। দুপাশের দুটি মাঝেরটির চেয়ে একটু নিচু। এভাবেই তৈরি হয়ে গেল স্মৃতিসৌধ। ভারি সুন্দর স্মৃতিসৌধ। সবাই খুব খুশি। সবাইকে বাগান থেকে সব ধরনের ফুল আনতে বলল। চা খাবে। ঘরের দিকে পা বাড়ালো জয়।

ঘরে গিয়ে বিছানায় উঠল না। ঘরের মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসল। প্লাস্টার করা পা একটা বালিশের উপরে রেখে আরাম করে বসল। চা খেয়ে ফুলের তোড়া বানাতে হবে। জয় চা খেয়ে ঘরের মেঝেতেই চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে।

সন্ধ্যার পর। সবাই ফুল নিয়ে হাজির। জয় প্লাস্টার করা পা বালিশের উপরে রেখে আরাম করে বসল। শুরু হলো তোড়া বানানো। রাত বারোটার আগে কাজ শেষ করতে হবে। বারোটা এক মিনিটে সবাই স্মৃতিসৌধে যাবে। পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করবে।

তোড়া বানানোর কাজ প্রায় শেষ। সাইকেলের চাকার মতো গোলাকৃতির তোড়া। তোড়ায় নানারকম ফুল গাঁথা হলো। তোড়ার ঠিক মাঝখানে জয়ের আর্ট করা পুষ্পাঞ্জলি কথাটি গাঁথা হলো। তোড়ার কাজ সম্পূর্ণ শেষ। রাত বারোটা বাজতে আরো এক ঘণ্টা বাকি। জয় সবাইকে বলল, ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে কালো জামা পরে আসতে। সাথে সাথে অমির প্রশ্ন, কালো জামা কেন মামা? জয় বলল, 'কালো বেজ দেখেছ?' 'দেখেছি মামা।' 'কোথায় পরে?' 'বুকে'। 'কেন পরে জানো?' 'না মামা।' 'হুম। কালো বেজ হচ্ছে শোকের প্রতীক।

আমরা যখন শোকাহত হই। তখন বুকে কালো বেজ ধারণ করি। আমরা যখন শহিদমিনার বা স্মৃতিসৌধে যাই তখন শহিদ ভাইদের স্মরণে শোকাহত হয়ে যাই। তাই স্মৃতিসৌধে যাওয়ার সময় আমরা কালো পোশাক পরে যাব। কালো পোশাকও শোকের প্রতীক।' এবার প্রমির প্রশ্ন, 'আমরা কালো বেজ পরব না মামা?' 'হ্যাঁ, পরবে। আমার কাছে কালো বেজ আছে। আমি তোমাদের কালো বেজ পরিয়ে দেবো।' আর দেরি নয়। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে আসো। সময় বেশি বাকি নেই। রুহান বলল, এই বেজ নিয়ে স্কুলে যাওয়া যাবে চাচ্চু? যাবে। তোমরা সবাই কাল সকালে কালো জামা আর কালো বেজ পরে স্কুলে যাবে। ইভানের মুখেও হাসি ফুটল। রুহান, ইভান এই দুজন কথা বলে কম। এই দুষ্টু দুটো ওদের চাচ্চুর সামনে এলে ইচ্ছে করেই চুপ থাকে। চুপ থেকে বোঝায় ওরা খুব শান্ত ছেলে। ভেতরে-ভেতরে দুষ্টুর যম। এক নম্বরের ফাঁকিবাজ।

রাত বারোটা বাজার দুই-তিন মিনিট আগে সবাই এসে হাজির। সবার গায়ে কালো জামা। কিন্তু পায়ে জুতা পরা। জয় বলল, পায়ে জুতা রাখা যাবে না। জুতা খুলে ফেল সবাই। অমির প্রশ্ন, জুতা খুলব কেন মামা? 'স্মৃতিসৌধ আর শহিদমিনার পবিত্র জায়গা। শহিদ ভাইদের কবরস্থান। ওখানে কি জুতা নিয়ে যাওয়া যায়? কখনো না। সবাই জুতা খুলে ফেল।' জয় সবার বুকে কালো বেজ গেঁথে দিলো।

রাত বারোটা বাজতে দুমিনিট বাকি। ঘর থেকে স্মৃতিসৌধে যেতে দুমিনিট লেগে যাবে। এখনই বের হতে হবে। অমি, প্রমি, রুহান, ইভান চারজনে তোড়াটি হাতে নিল। এক দিকে অমি, প্রমি। অন্যদিকে রুহান, ইভান। জয় বলল, তোড়া নিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হতে। সবাই তোড়া নিয়ে বের হচ্ছে। পিছনে জয়। স্মৃতিসৌধের কাছে গেল সবাই। জয় পিছন থেকে সবাইকে নীরব হয়ে দাঁড়াতে বলল। স্মৃতিসৌধের কাছে সবাই নীরব দাঁড়িয়ে। জয় মাঝে ঢুকল। হাতের ঘড়িতে টাইম দেখে নিল। কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। সবাই নম্র আর নীরব ভঙ্গিতে তোড়াটি স্মৃতিসৌধের নিচের স্তরে রাখল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শহিদ ভাইদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া করা হলো। ■

স্বাধীনতার গল্প

জাহাঙ্গীর ডালিম

বায়না ধরে ছোট্ট খোকা মায়ের গলা ধরে-
মাগো তুমি স্বাধীনতার গল্প শোনাও মোরে।
সজল হলো চোখ মায়ের বুক ফেটে যায় শোকে।
বলছে- বাছা, সেই কথাটা কেমনে শোনাই তোকে?
বাবা যে তোর যুদ্ধে গেল ফিরল না আর ঘরে,
একাত্তরে জন্ম নিলি স্বাধীনতার পরে
বাবা কেন ফিরল না মা, সেই কথাটা বলো।
নাই যদি ফিরবে তবে যুদ্ধে কেন গেল?
যুদ্ধে যদি না-ই যেত, দেশ কেমনে স্বাধীন হতো?
মুক্তি পাগল বীর বাঙালি প্রাণ দিয়েছে যত!
লক্ষ শত মুক্তি সেনা স্বজন ছেড়ে গেল;
দেশের লাগি রক্ত দিলো, আর ফিরে না এল,
পাক বাহিনীর হিংস্র থাবায় জীবন দিলো তারা,
সোনার বাংলা শ্মশান আজি, তাই তো স্বজনহারা
চোখের জলে বুক ভেসে যায়, দুঃখ যে নাই তাতে।
স্বাধীনতার লাল পতাকা পেয়েছি আজ হাতে।

কল্পবিজ্ঞান

‘যদি রাত পোহালে শোনা যেত!’

নাসরীন মুস্তাফা

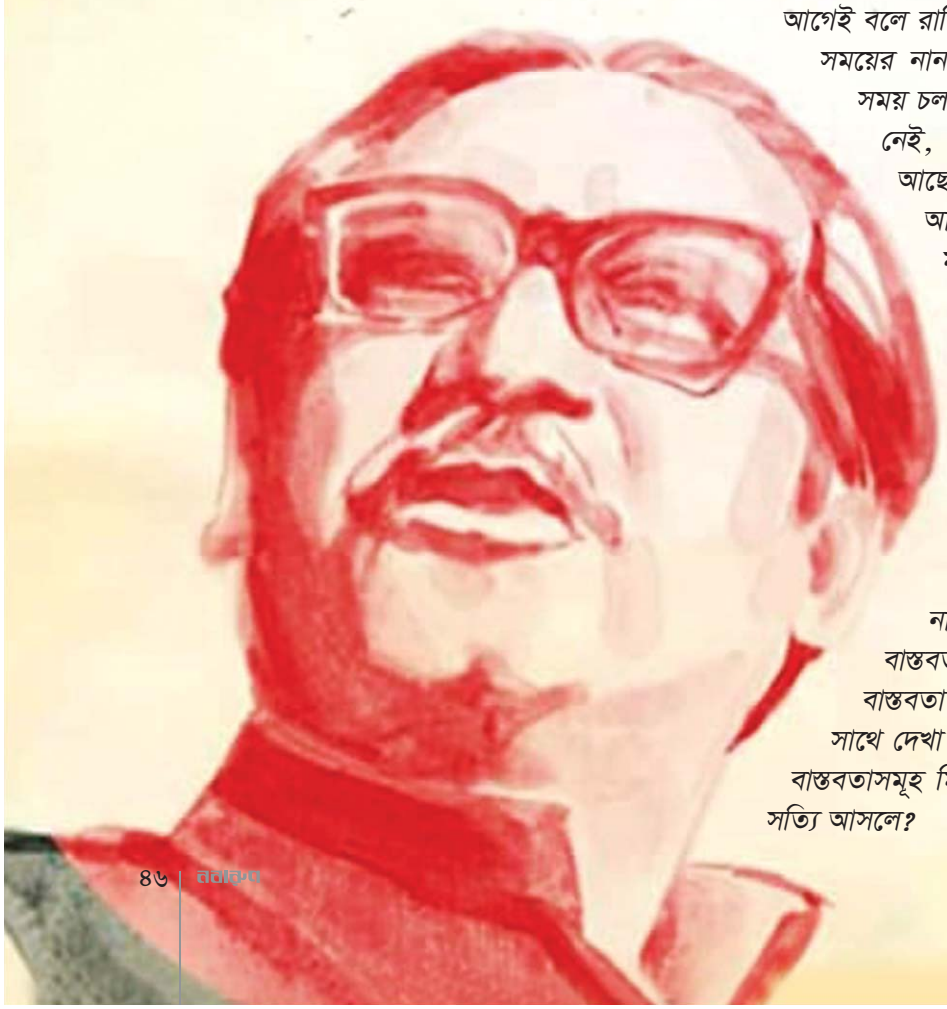

আগেই বলে রাখি, এই গল্পটা সময়কে নিয়ে। সময়ের নানা সময় আছে, আবার নেই। সময় চলমান, আবার চলমান না। ধরে নেই, সময়ের শরীরে অসংখ্য বিন্দু আছে। এক এক বিন্দুতে বাস আমাদের। আমরা এই সময়ের মানুষরা সময়ের একই বিন্দুতে আছি বলে বুঝতে পারছি না অন্য বিন্দুতে বা অন্য সময়ে যারা আছে (ছিল বা থাকবে), তাদের কি অবস্থা। এক এক বিন্দুতে এক এক রকমের বাস্তবতা। এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে যেতে পারলে (আমি পারি না বলে কেউ কি পারে না?) বাস্তবতা বদলে যাবে। বিন্দু অসংখ্য। বাস্তবতা অসংখ্য। সময়ে যে বাস্তবতার সাথে দেখা হয়ে যায়, তা-ই সত্য। বাকি বাস্তবতাসমূহ মিথ্যে বলে মনে হয়। তা কি সত্যি আসলে?

এই গল্পে নেমে আসা সাতজন মানুষ গল্পের সময়ের নয়। অর্থাৎ সময়ের অন্য বিন্দুতে অন্য বাস্তবতায় বাস ছিল ওদের। সময়ের আরেক বিন্দুর বাস্তবতায় নেমে এল ওরা। কিন্তু কেন?

সত্য বাস্তবতা কিংবা বাস্তবতাকে সত্য করে তোলা

মাঝরাতেই ঢাকা শহরের পথে নেমে আসে ওরা। নেমে আসাটা ওদের জন্য খুব কঠিন হয় না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার মতোই খুব সহজ একটা কাজ আসলে। জানলেই পারা যায়।

একটু পরেই আজান পড়বে। তার আগেই ওরা ঠিক ঠিক পৌঁছে গেল। ওরা সাতজন।

কোথায় পৌঁছে গেল, জানতে চাও?

আরেকটু পড়লেই বুঝতে পারবে, ওরা কোথায় পৌঁছে গেল। কেননা, জায়গাটা তোমাদের খুব চেনা। আর সেই জায়গায় যে মানুষটি কথা বললেন, তাঁকে তোমরা খুব চেন। খুব জানো।

সেই মানুষটি ওদেরকে প্রশ্ন করলেন। 'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্?'

মানুষটির চোখে কাল ফ্রেমের চশমা। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। পরনে লুঙ্গি।

প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। সময় একদম মাপা। কি করতে হবে, সব ঘড়ি ধরে ঠিক করা। তাই সোজাসুজি বলে ফেলা চাই যা বলার।

মুহিতুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সহকারী। প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রপতিকে মুহিতুল কিছু বলতে পারলেন না। কী বলবেন! তিনি নিজেই তো বুঝতে পারছেন না কিছু।

এই মানুষগুলো এই বাড়িতে ঢোকার পথে পুলিশ বাধা দিয়েছিলেন। ওরা বলেছিল, অনেক দূর থেকে এসেছি। ফেরা যাবে না। পুলিশ ভেবেছিলেন, ঢাকায় বোধ হয় থাকার জায়গা নেই এদের। অনেক দূরের গ্রাম থেকে রোজ কত মানুষই তো আসে। এরাও সেরকম এসেছে। মাঝরাত হয়ে গেছে বলে এদেরকে তাড়িয়ে দিলে তিনি যদি জানতে পারেন, রাগ করবেন। তার চেয়ে এরা থাকুক। ভেতরে ঢুকুক। অপেক্ষা করুক সকালের।

পুলিশই ওদেরকে নিয়ে এসেছিল মুহিতুল ইসলামের কাছে। মুহিতকে ওরা কেবল বলেছিল, এখুনি দেখা করতে হবে। এখুনি।

মুহিতুল ভেবেছিলেন, খুব জরুরি কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবে হয়ত এরা। কম বয়সী ছেলেপুলেদের দিন-রাতের হিসেব থাকে না। অথবা আসলেই বিষয়টা এতটাই জরুরি যে রাতে না বলে পারছে না। আর তাই রাতেই চলে এসেছে এরা। ওদেরকে বাধা দেওয়াটা ঠিক হবে না। জরুরি বিষয়টা জরুরি ভাবে না জানলে পরে যদি তিনি রাগ করেন। যদি তাতে কোনো ঝামেলা হয়, তিনি দুঃখ পাবেন। তাঁকে দুঃখ দেওয়া মুহিতুলের পক্ষে সম্ভব না।

মুহিতুলই সিঁড়ির কাছে নিয়ে এসেছিলেন ওদেরকে। একটু অপেক্ষা করতে বলে কোথায় যেন গেলেন। ওরা জানে, মুহিতুল কোথায় গেছেন। তার সাথে দেখা হওয়ার আগে আর কার সাথে দেখা হবে, তা তো ওরা জানেই। কেননা, সময়ের কোন বিন্দুতে কার কার উপস্থিতি, তা তো একেবারে ঠিক করা। সময় ঠিক থাকবে, কেবল বাস্তবতা যাবে বদলে, কথা তো ছিল এরকমই।

ওরা যে বাস্তবতাকে তৈরি করছে, তা সত্য, আপাতত।

প্রতিরোধ তৈরি করা হলো

রাতের অন্ধকার তখনো কাটেনি। আজান পড়ছে মসজিদে মসজিদে। এর মাঝেই জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক নেমে এল রাস্তায়। গুলির আওয়াজ চলছে বাড়িটাকে ঘিরে। এই আওয়াজই তাঁকে জাগিয়ে দিয়েছিল। তিনি এগিয়ে এলেন। বড়ো ছেলেটা প্রতিরোধ করছে টের পেলেন। যোদ্ধা ছেলে। কিন্তু একা আর কতটুকু করবে!

তিনি ছুটে গেলেন টেলিফোনের কাছে। সেনাপ্রধানকে বললেন সাহায্য পাঠাতে। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, 'কামালকে বোধহয় মেরে ফেলেছে!'

সেনাপ্রধান টেলিফোনের ওপারে কেঁচো হয়ে কুঁকড়ে যায়। মানুষ থাকে না একটুও। কোনো সাহায্য করা নাকি তার পক্ষে সম্ভব না। কেঁচোরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখেনি বলে পিঠ সোজা করে লড়তে জানে না। কেঁচোরা কাউকে বাঁচানোর জন্য ঢাল হতেও পারে না।

তিনি খুব অবাক হন। কেঁচোটাকে তিনি মানুষ ভেবেছিলেন!

গুলির আওয়াজ বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থেমে যায়। তিনি কামালের কথা ভাবছিলেন। গোটা জীবনে কতবার তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা এক ঝলকে মনে পড়ে গেল। পাকিস্তানিরা তাঁকে মারতে চায়, তিনি জানেন। দেশ স্বাধীন হলো, তবুও পাকিস্তানিরা তাঁর বাড়িতে চলে এসেছে তাঁকে মারতে!

জামিলকে ফোন করলেন। সেনাপ্রধানের মতো কেঁচো নন জামিল। বাজপাখির মতো উড়ে আসবেন, টেলিফোনের ওপারে তার ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনলেন তিনি। মনটা স্থির হলো। মনের ভেতর খুশি জমল। বাংলার মাটিতে কেঁচো আছে বটে, আকাশে বাজপাখিও ওড়ে কিন্তু।

জামিল আসা পর্যন্ত শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তিনি এই দেশের রক্ষাকর্তা। তিনি এই বাড়ির প্রতিটি সদস্যেরও রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই তিনি দ্রুত ছুটে যান বড়ো ছেলে কামালের কাছে। কামালকে বোধহয় মেরে ফেলেছে, এ কথা বললেও কামালের রক্তাক্ত লাশ তাঁকে দেখতে হবে, এ কথা ভাবেননি। প্রাণপ্রিয় সন্তানের রক্তাক্ত লাশ কেন তাঁকে দেখতে হবে? যে-কোনো বাবার মতো তাঁর বুকটা কষ্টে ভরে ওঠার মতো কষ্ট কেন তাঁকে পেতে হবে?

তিনি ছুটতে ছুটতেই দেখেন, কামাল লড়ছেন। কামালের বয়সী আরো কিছু ছেলে পিঠে পিঠ লাগিয়ে লড়ছে। ওদের ক্ষিপ্র গতি দেখে তিনি একটু চমকে গেলেন। চমক কাটতেই টের পেলেন, কামালকে আর দেখছেন না। ছেলেদের একজন কামালকে ঝটকা টানে সরিয়ে নিয়ে যায় কোথাও।

ছেলেদের দুইজন তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে যেতে হবে।

'তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্?'

জীবনের অনেকগুলো বছর এই প্রশ্নটার উত্তর তিনি পেয়েছেন একটাই। যারা তাঁকে নিতে আসত, তাঁরা তাঁকে একটা জায়গাতেই নিয়ে যেতে চাইত। কারাগারে। এই ছেলেগুলো তাঁকে কারাগারে নেবে, মনে হচ্ছে না। এই ছেলেগুলো পাকিস্তানি নয়, বাংলাদেশের, বাঙালি। এরা সেই বাঙালিদের স্বজন, যাদেরকে তিনি বিশ্বাস করেন, ভালোবাসেন।

ওরা একসাথে কথা বলতে চায়নি। একজন বলবে বলেই ভেবেছিল। কিন্তু মানুষটার সামনে দাঁড়ানোর পর কেউ মুখ বন্ধ করে রাখতে পারেনি। একসাথে কথা বলছিল বলে ঠিকঠাক বুঝে ওঠাটা মুশকিল হলো। তিনি তখন মুহিতুল ইসলামকে বললেন, 'এরা কি বলতে চায়, বুঝতে পারছিস্?'

মুহিতুল পুরোটা বোঝেননি। তবে এরা যে তাঁকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চায়, তা বুঝতে পারছিলেন। এরা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়তে চায়, এটাও বুঝেছেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়ানো দুইজন কী অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় উড়িয়ে দিচ্ছে বাইরের শত্রুদের, তা দেখে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। বাড়িতে ঢোকার সময় ওদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। অথচ এখন, হাত বাড়িয়ে কেবল তর্জনী তাক করছে। তর্জনী থেকে ছুটে যাচ্ছে আগুনের ঝলক। বাইরে থেকে ভেসে আসছে চিৎকার চেঁচামেচি, কান্নার শব্দ।

তিনি তাঁর তর্জনীর দিকে না তাকিয়ে পারলেন না। ভাষণ দেওয়ার সময় নিজের অজান্তেই তাঁর তর্জনী উঠে যায় আকাশে। তাঁকে ঘিরে থাকা জনগণ তাঁর তর্জনীর আকাশে উঠে যাওয়া দেখার অপেক্ষায় থাকে, তা তিনি জানেন। তাঁর আকাশে উঠে যাওয়া তর্জনী মানুষকে সাহস জোগায়, তাও তিনি জানেন। এই তর্জনীকে তিনি কোথায় আড়াল করবেন? কোথায় যাবেন তিনি?

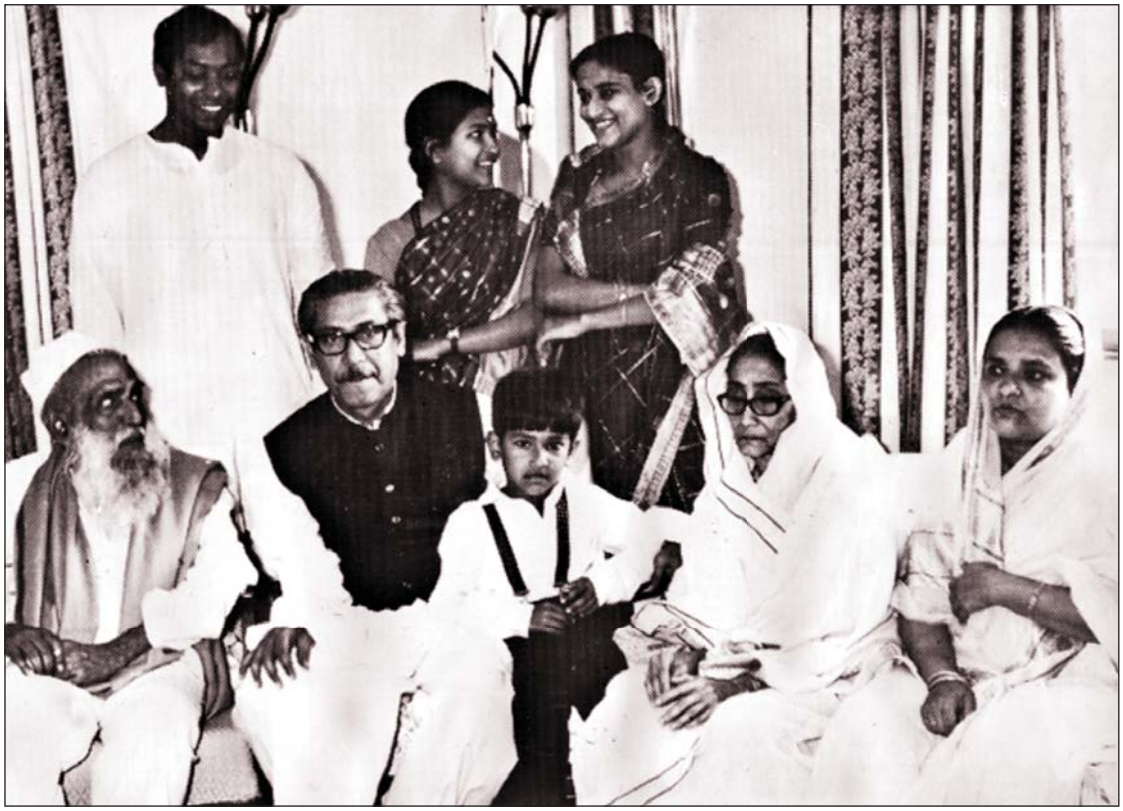

শত ব্যস্ততার মাঝেও পরিবারের সাথে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন বঙ্গবন্ধু

দুইজন তাঁর দুইপাশে দাঁড়িয়ে যায়। সিঁড়ির মাথায় তিনি। তাঁকে ওরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাঁকে ওরা নিরাপদে রাখতে চায়।

ঠিক সেই সময় সিঁড়ির নিচে এসে দাঁড়ায় শত্রুরা। অস্ত্র উঁচিয়ে হুংকার দেয়। তিনি ধমকে ওঠেন। 'কারা এরা?'

তিনি আসলে নিশ্চিত হতে চান, এরা সত্যিই ভুট্টো-ইয়াহিয়ার লোক কী না। দেখতে বাঙালি বলেই কি তিনি বিভ্রান্তিতে ভুগলেন? নিশ্চিত হতে চাইলেন এদের পরিচয়?

বাঙালিকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেন যে। বাঙালিকে বিশ্বাস করা তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা, তিনি বলেছিলেন। বাঙালিকে বিশ্বাস করা তাঁর সবচেয়ে বড়ো শক্তি, তিনি তো এও বলেছিলেন।

তিনি যদি জেনে যান, এরা আসলেই বাঙালি, তাহলে কত কষ্টই না তিনি পাবেন!

এরপর?

তাঁর শক্তিতে শক্তি জমে দুটি তর্জনীতে। তাঁর দুপাশে থাকা দুইজন তর্জনী বাড়িয়ে দিতেই ছুটে যায় আগুন। শত্রুদের চিৎকার চেঁচামেচি আর কান্নার শব্দ খুব দ্রুত মিলিয়ে যায়। মিলিয়ে যায় শত্রুরাও। সিঁড়িটা সিঁড়িই থাকে।

তিনি দেখেন, তাঁর ঠিক পেছনে কামাল। কামালের পেছনে জামাল। জামালের পেছনে সুলতানা কামাল। সুলতানা কামালের পেছনে রোজি জামাল। ঘুম থেকে উঠে কিছু বুঝতে না পারা বেগম মুজিব ছিলেন সবার পেছনে। ছোট্ট রাসেল মুহিতুল ইসলামের তর্জনী জড়িয়ে ধরে আরেক হাত দিয়ে চোখ ডলছিল। এভাবে

ঘুম থেকে উঠে অবাক হওয়ার ঘটনা ওর ছোট্ট জীবনে আর আছে কি?

সাতজন বাড়ির সবাইকে নিয়ে নেমে আসে বাগানে। গন্ধরাজ ফুলের পাগল করা গন্ধ পুরো বাগান জুড়ে বাতাসের সাথে নাচছে। আকাশে বিশাল চাঁদ ভোরের আলোয় হালকা হয়ে গেছে। সেই সাথে কোথায় মিলিয়ে গেছে ভয়ংকর শত্রুরা। কে বলবে, একটু আগেই ভয়ে কুঁকড়ে উঠছিল সবাই। মনে হচ্ছিল, শত্রুরা বুঝি আর সকাল হতে দেবে না এই বাড়িতে।

সকাল হচ্ছে। হচ্ছে সকাল। তিনি এই সকালকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরতে চান। তাঁর প্রিয় মানুষগুলোকে বিশাল দুই হাতের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকলেন। খালি গলায় গেয়ে উঠলেন, 'আমার সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে...ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।'

তাঁর বিশাল বুকের মাঝে সবুজ বাংলা, সেখানে মুখ রেখে সবাই গেয়ে ওঠে একই গান। 'আমার সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি।'

ঠিক এরকম সময়ে কর্ণেল জামিল আহমেদ ছুটতে ছুটতে এলেন। তিনি ঠিক আছেন দেখে মানুষটার আনন্দ আর বাঁধ মানে না। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিয়ে তিনি সেই সকালে লম্বা একটা স্যালুট দিলেন সত্যিকারের সেনার মতো।

তিনি হাসলেন। তার হাসিতে হেসে উঠল সকাল। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ঘুমভাঙা সূর্যটা।

তিনি ছেলেগুলোকে কাছে ডাকতে চাইলেন। হাত বাড়িয়ে দিলেনও। পেলেন না। কোথায় গেল ছেলেগুলো?

ছেলেগুলোর কাজ শেষ কি? ওরা যে চলে গেল!

ভবিষ্যৎ কিংবা অন্য বাস্তবতা

মাথা থেকে হেলমেটের মতো যন্ত্রটা খুলে ফেলে সাতজন।

সময়ের যে বিন্দুতে আমাদের বাস, আমাদের বাস্তবতা, তা ওদের নয়। ওরা যে বিন্দুতে আছে, তাকে তুমি চাইলে ভবিষ্যৎ সময় বলেও ভাবতে পারো। সেই সময়টা কেমন? কেমন সেই সময়ের বাস্তবতা?

সব শুনলে খুব ভালো বলতে পারবে না তুমি। ওরাও পারছিল না। দিনের পর দিন মনটা বিষিয়ে উঠছিল। কিচ্ছু ভালো লাগে না। পৃথিবীটা এখন যেমন হয়ে গেছে, তেমনটা না হয়েও তো অন্য রকম হতে পারত। মানুষের চেহারায় অমানুষের ভিড় চারদিকে। একদল কেবলি শোষণ করছে। আরেকদল কেবলি শোষিত হচ্ছে।

একদিন নিজেরাই ক্ষেপে উঠেছিল আলাপে। কোনো এককালে একজন মানুষ ছিলেন, যিনি শোষিতের পক্ষে আছেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। শোষকের দল তাকে বাঁচতে দেয়নি। তাঁকে নিহত হতে হয়েছিল।

সাতজনের একজন বলে উঠেছিল, আহা! যদি তাঁকে হারাতে না হতো, তাহলে এই সময়টা সত্যিই অন্য রকম হতে পারত।

যদি তাঁকে আমরা না হারাই? বলেছিল বাকিরা।

সেটা কীভাবে হতে পারে?

তাঁকে হারানোর বাস্তবতাকে সামনে আসতে না দিলেই তো হয়। তাঁকে না হারানোর সম্ভাবনাকে বাস্তবতায় পরিণত করতে পারলেই তো হয়।

সম্ভাব্য বিকল্প বাস্তবতাকে খুঁজতে সাত বন্ধু ঢুকে পড়েছিল সম্ভাব্য বাস্তবতার জগতে। হেইজেনবার্গ যেমন বলেছিলেন, নিশ্চয়তা নয়, সম্ভাবনা বা সম্ভাব্যতা দিয়ে তৈরি জগত আছে, যার মুখোমুখি হলেই সম্ভাব্যতা পরিণত হয় নিশ্চয়তায়।

সাত বন্ধু সম্ভাব্যতাকে নিশ্চয়তায় বদলে দিতে চেয়েছিল।

১৯৫২ সালে এরউইন শ্রোডিঙ্গার যখন বলছিলেন, 'ভিন্ন ভিন্ন সময়ের নয়, বরং সবগুলো ইতিহাস একই সাথে ঘটে', তখন বাংলা ভাষার জন্য শহিদ হয়েছিলেন রফিক-শফিক-বরকত কত নাম!

সাত বন্ধু তাঁর বেঁচে যাওয়ার ইতিহাসকে ঘটিয়ে দিতে

চেয়েছিল। ওরা গোল হয়ে বসে। হেলমেটের মতো যন্ত্রটা মাথায় দিয়ে চোখ বুঁজে ফেলার আগ মুহূর্তে দেখে একজন আরেকজনকে। সবার সাথে সবার সংযোগ ঘটছে কি না, বুঝে নিতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নাম বলে।

ওদের নাম কি, ভালো করে শুনে রাখ। ভুলবে না কিন্তু। কোনো সময়েই ভুলবে না।

ওদের নাম ছিল, ওদের নাম হয়, ওদের নাম হবে রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, নূর মোহাম্মদ, মতিউর, রুহুল আমিন।

নাম বলা শেষ হতেই ওরা সাতজন সংযুক্ত হয় সময়-যন্ত্রের সাথে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখের সময়ের সাথে সংযুক্ত হয় ওদের সময়। সংযোগ গড়ে দেয় সেতু অথবা সিঁড়ি। টুপটুপ করে খুব সহজেই ওরা তখন ঢুকে পড়ে সেই সময়টায়। সময়ের সেই বিন্দুকে বদলে দিতে সেই সময়েই তো ঢুকতে হবে, তাই না?

জানি না, ওরা আসলেই কী বদলে দিতে পেরেছিল সময়ের বাস্তবতাকে? অন্য বাস্তবতার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে তিনি কি সত্যিই দেখেছিলেন সকালের সূর্য? পেরেছিলেন কি?

হয়ত পেরেছিলেন। তাঁকে নিহত হতে দিয়ে আমরা সময়ের যে বাস্তবতা গড়েছি, তাতে সূর্যের আলোর আশা আমরা করতে পারি না। কিন্তু বাস্তবতাকে যদি ওরা সত্যিই বদলাতে পারে, তাহলে তো সূর্য উঠবেই, তাই না?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই যে ছিলেন সাহস আর ভালোবাসায় টগবগ করতে থাকা এক সূর্য। আহা, যদি রাত পোহালে আমাদের আকাশে সূর্যটা সত্যিই উঠত! তাহলে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর আনন্দটা মহাকাশ সমান আনন্দ উপহার দিত আমাদের, তাই না? ■

মাশরুর সাকিব, তৃতীয় শ্রেণি, হার্ডকো ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

শাফিকুর রাহী'র কবিতাগুচ্ছ

সতেরোই মার্চ ভোরে

একটি মানুষ স্বপ্ন গড়ার সুখ-আনন্দে ভাবেন
জগজ্জয়ের দীপ্ত অভিযানে তিনি যাবেন।
সে ভাবনাতে বিশ্বমনে চমক ফুটেছিল
মানবতার মুক্তির দূত গর্জে উঠেছিল।
জীবন বাজি রেখে নেতা সংগ্রামও চালাল
অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী তাঁর ভয়ে পালাল।
খানসেনারা সব জ্বালাল- মাটির ডেরা চালও
মেঘলাকাশে আলোর নিশান বিদ্যুৎও চমকাল।
বীরবিচ্ছু গেরিলারা- কার সে মহা ডাকে-
দেশের জন্য বীরের বেশে প্রাণ দিল লাখে লাখে!
মাটি-মানুষ ভালোবেসে জীবন দিয়ে লড়ল
আকাশ দাওয়ায় তাঁর ছবিটি সবার চোখে পড়ল।

মা ও বোনের সম্ভ্রম আর লাখো আত্মদানে
গৌরবেরই বিজয় মশাল জ্বলল যে উদ্যানে।
আমরা হলাম মুক্ত স্বাধীন তাঁর সে অবদানে
আনন্দেরই বইল ধারা সবার প্রাণে প্রাণে।
বন-বনানী নদনদীতে জমিন ও আসমানে
জয় বাংলার উঠল ধ্বনি সমুদ্র সাম্পানে।
উনিশ'শ বিশ সালে ও ভাই সতেরোই মার্চ ভোরে
সোনার খোকন জন্ম নিলেন বাতাস নাচল দোরে-
কী নাম তাহার; কোন মহাবীর; বলতে কেউ পারো?
তিনি হলেন জগজ্জয়ী বাংলাদেশের প্রাণও।
নীল আকাশের তারায় তারায় কার ছবিটি হাসে?
ঘরে ঘরে খুশির হাওয়া আনন্দ উল্লাসে।

আজকে তাঁহার শততম শুভ জন্মদিনে
বিশ্ববিবেক জানায় সালাম মানবতার ঋণে।
তাঁর অবদান অমর ত্যাগে সাহস জোগালেন
বঙ্গবন্ধু থেকে তিনি বিশ্ব বন্ধু হলেন।

বিশ্ব সেরা শব্দগুচ্ছ

জয় বাংলা এ শব্দটি বিশ্ব সেরা ভাইরে
বঙ্গবন্ধুর শেষ উচ্চারণ যার তুলনা নাইরে।
বিশ্বমানব ইতিহাসে সভ্যতা-সোপানে
উঠল জেগে পুরো দেশটা শব্দ জয়গানে।
যাঁর আকর্ষণ শক্তিতে ভাই কাঁপল বিশ্ববাসী
এক সাগর রক্তে কেনা দেশকে ভালোবাসি।

জয় বাংলা-বঙ্গবন্ধু স্লোগানের টানে
লক্ষ-কোটি মানুষ জাগে লাগল দোলা প্রাণে।
এমন মন্ত্র-জাদুমাখা শব্দেরই ঔজ্জ্বল্যে
মাটি-মানুষ জাগ্রতপ্রাণ সাহসী সাফল্যে।
বাঁচব না হয় মরব সবে দীপ্ত শপথ পাঠে
গর্জে ওঠে মুক্তিসেনা সম্মুখ যুদ্ধের মাঠে।

জয় বাংলা-বঙ্গবন্ধু শব্দ জাদুকলায়
লক্ষ প্রাণের শুনবে রোদন নীল সাগরের তলায়।
বলবে তারা শোনো ও ভাই; এ শব্দের কাহিনি
যাঁর শক্তিতে বলিয়ান হলো বীর মুক্তিবাহিনী।
সাতই মার্চের সেই ভাষণের বিদায় উচ্চারণে
পিতার কণ্ঠে জয় বাংলা ঝাঁপিয়ে পড় রণে!

যাঁর মন্ত্র মহিমায় জাগে লক্ষ কোটি প্রাণও
যুগল শব্দের তীব্র তোড়ে পাকিস্তানি দানো।
রণাঙ্গনে প্রাণের ভয়ে কাঁপন ধরে যার
পিতার ডাকে ভাগল বর্গি পাকি-স্বৈরাচার।
জয় বাংলা বঙ্গবন্ধু বুকে লালন করব
পিতার মহান আদর্শতে আমরা জীবন গড়ব।

নিবন্ধ

মানবদরদি বঙ্গবন্ধু

মঈনুল হক চৌধুরী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও রাজনৈতিক তৎপরতা খেয়াল করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন আজীবন মানবদরদি। শোষণ-বঞ্চনার অবসানই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সেটা যেমন বাঙালি জাতির জন্য তেমনি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেও। পুরো জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন তাঁর রাজনীতি ছিল মানুষের কল্যাণে। একটি স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে বাঙালির মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। আমৃত্যু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল গরিব মানুষের সেবা করা। তিনি গরিবদুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন। পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মুখে খাদ্য তুলে দিতে চেয়েছেন। তাদের মাথার ওপর ছাদ দিতে চেয়েছেন। শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য। উল্লেখ্য, সবকিছুকে শেখ মুজিব মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। গরিবদুঃখী মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অন্যরকম দরদ। মাসে কয়েকবার তাঁর জন্য ছাতা কিনতে হতো। কারণ, কোনো ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারছে না, দূরের পথ, রোদ-বৃষ্টিতে হেঁটে আসতে কষ্ট হয়, তা দেখে নিজের ছাতা দিয়ে দিতেন। সহপাঠী গরিব ছাত্রদের তিনি পেলেই নিজের পড়ার বই, নিজের নতুন খাতা দিয়ে দিতেন। একদিন স্কুল ছুটির সময়, শেখ মুজিবের মা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। মুজিব আসবে। দূর থেকে তিনি রাস্তার উপর নজর রাখতেন। তিনি দেখলেন তাঁর ছেলে গায়ে চাদর জড়িয়ে হেঁটে আসছে, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি নেই। ব্যাপার কী? তিনি শতচ্ছিন্ন কাপড় দেখে এক গরিব ছেলেকে সব দিয়ে দিয়েছেন। শেখ মুজিব তখন চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। বিকালবেলা স্কুল থেকে বন্ধুরা মিলে একসাথে বাড়ি ফিরছিল। মাঘ মাসের কনকনে শীত। হঠাৎ চোখে পড়ে বড়ো রাস্তার মোড় ঘেঁষে গলির ধারে ধুলোর মধ্যে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক শীতে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে ভিক্ষা চাইছে। বৃদ্ধের শীর্ণ খালি গায়ের হাড়গুলো বড়ো স্পষ্ট, গোনা যায়। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ দু একটা পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছে। শেখ মুজিবও বন্ধুদের নিয়ে ভিক্ষুকের কাছে যায়। তারপর গায়ের চাদরটা মুহূর্তে খুলে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দেয়। সবাই তো অবাক। এরপর সে বাড়ির দিকে চলে যায়। শীতের সময় এভাবে দীনদুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন নিজের গরম চাদর আর জামা। ফসল ভালো হয়নি। দরিদ্র কৃষকদের ঘরে হাহাকার। শেখ মুজিব এমনি কিছু কৃষকদের বাড়ি ডেকে আনেন। তাদেরকে গোলা উজাড় করে ধান-চাল বিলিয়ে

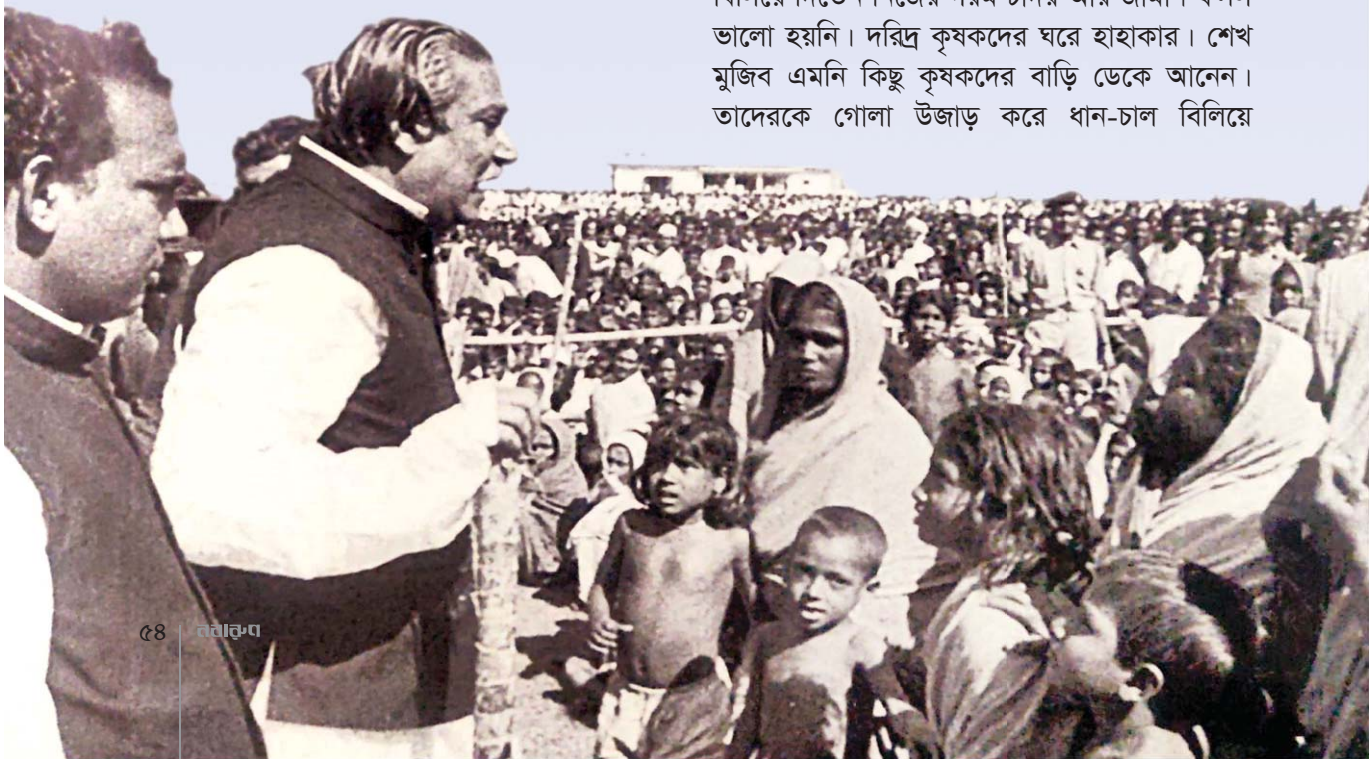

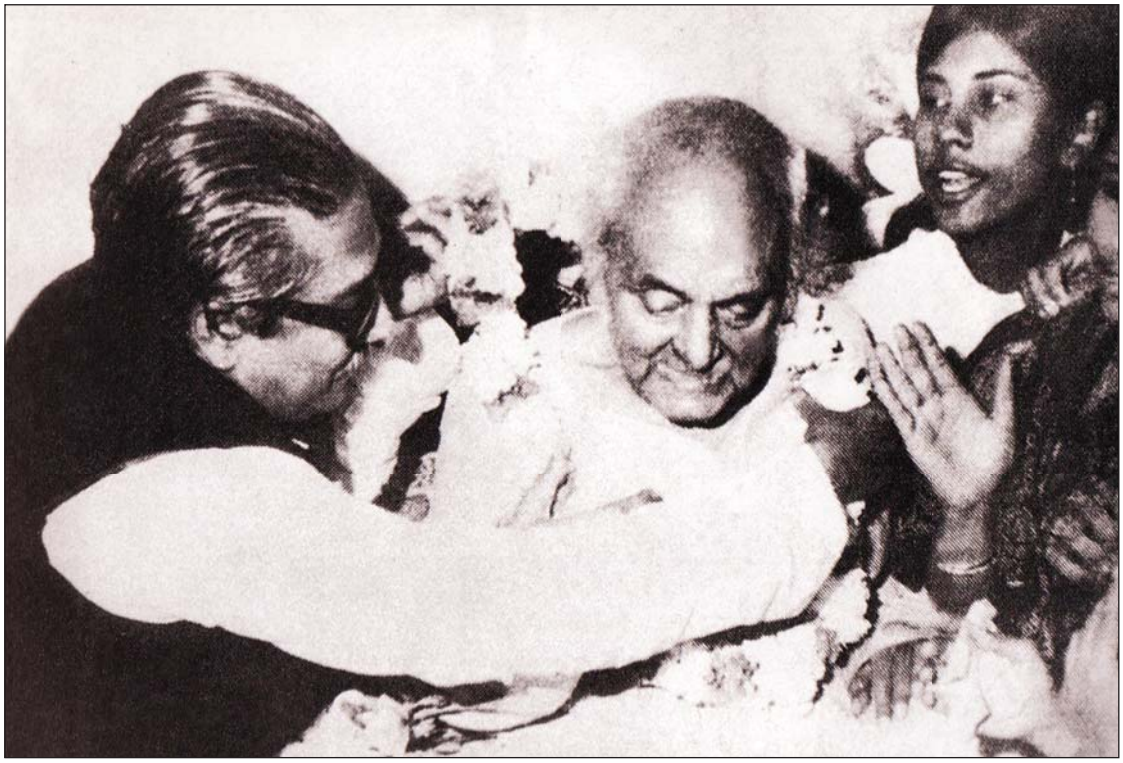

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কোলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু, ২৪শে মে ১৯৭২

দিলেন। তাঁর বাবা এ ব্যাপারটি জানতেন না। পরে বাবা যখন এ কাজের জন্য তাকে বকলেন, তখন তিনি বলেছিলেন 'গরিবেরও পেট আছে। তাদেরও খাবার প্রয়োজন। আমাদের বেশি ছিল। কিছু দিয়ে দিয়েছি মাত্র।' সেদিন বাবা ছেলের মহানুভবতায় ক্ষুব্ধ হওয়ার চেয়ে খুশিই হলেন। আরো একদিনের ঘটনা শেখ মুজিবের পিতাকে হতবিহ্বল করেছিল।

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি স্কুলের শিক্ষক বসু রঞ্জন সেনগুপ্তের বাসায় প্রাইভেট পড়তেন। একদিন সকালে তার বাড়ি থেকে পড়া শেষ করে আসার পথে এক খালি গা ছেলেকে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলে ছেলেটি বলল, তার গায়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই। সাথে সাথে মুজিব গায়ের গেঞ্জি খুলে ওই ছেলেকে দিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে আসেন চাদর গায়ে, আদুল গায়ে। ছেলেটির কষ্ট সেদিন শেখ মুজিব সহ্য করেননি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তি জীবনে, রাজনীতিবিদ হিসেবে, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সেই দর্শনের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ভোগে বিশ্বাসী ছিলেন না। যার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন একাধিকবার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে। জাতির পিতা নিজের বা তাঁর পরিবারের দিকে তাকাননি। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। একজন মানুষ যিনি তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে প্রায় তেরো বছর জেলে ছিলেন। দিনের পর দিন পরিবারকে সময় দিতে পারেননি, নিজে পরিবারের সান্নিধ্য পাননি। আরাম-আয়েশ-বিলাস কী জিনিস তিনি জানতে পারেননি। মানুষের জন্য, জনগণের জন্য, জাতির জন্য তাঁর কাজ করার আকুলতা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর দেওয়া বক্তব্যে। তিনি নিজ কণ্ঠেই বলে গেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, বাংলার মানুষের মুক্তি চাই।' এ দর্শনই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন চারদিকে। যে রাজনীতিতে ত্যাগ এবং মানবসেবাই মূলকথা। তাই তো মানবদরদি বঙ্গবন্ধুর কথা বাঙালি জাতি স্মরণ করবে অনন্তকাল। ■

গল্প

লাল পুটলি

উৎপলকান্তি বড়ুয়া

ছেলেটা কে, কেউ জানে না। কে জানবে! সবাই ছুটছে। যে যার মতো ছুটছে। দলে দলে ছুটছে। হাজার হাজার মানুষ ছুটছে। গত বেশ কদিন থেকে একটানা ছুটছে তো ছুটছেই। দিনরাত থামাথামি নেই। ছুটছে উত্তর দিকে। বিবির হাট হয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে রামগড়ের দিকে।

তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে। পড়ে আছে তেমনি রাস্তার পাশে। একটা কালো থলে ঝোলানো তার গলায়। দেখে বুঝা যাচ্ছে হয়ত বেশ ক'বেলা খাওয়াই হয়নি। শরীর খুব দুর্বল। হাঁটতে হাঁটতে জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় ঢলে পড়ে।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের ঢল। কেউ কেউ এক নজর ঝুঁকে দেখে আবার হাঁটে। কারো ফুরসত নেই, কী হলো, কী হয়েছে -তা জানার বা দেখার। সবাই দলে দলে ছুটছে তো ছুটছেই।

ছেলেটাকে দাদু নিয়ে আসে ঘরে। পাজাকোলা করে। মা দেখে তো প্রথমে হায় হায় করে ওঠে।

-কার ছেলে গো! কী হয়েছে তার! কেমন করে হলো- ইত্যাদি।

দাদু মাকে থামিয়ে দিয়ে বলে,

-আগে ওকে চোখেমুখে পানি দাও বৌমা। মাথায় একটু পানি ঢালো। দেখে বুঝাই যাচ্ছে বেশ কদিন

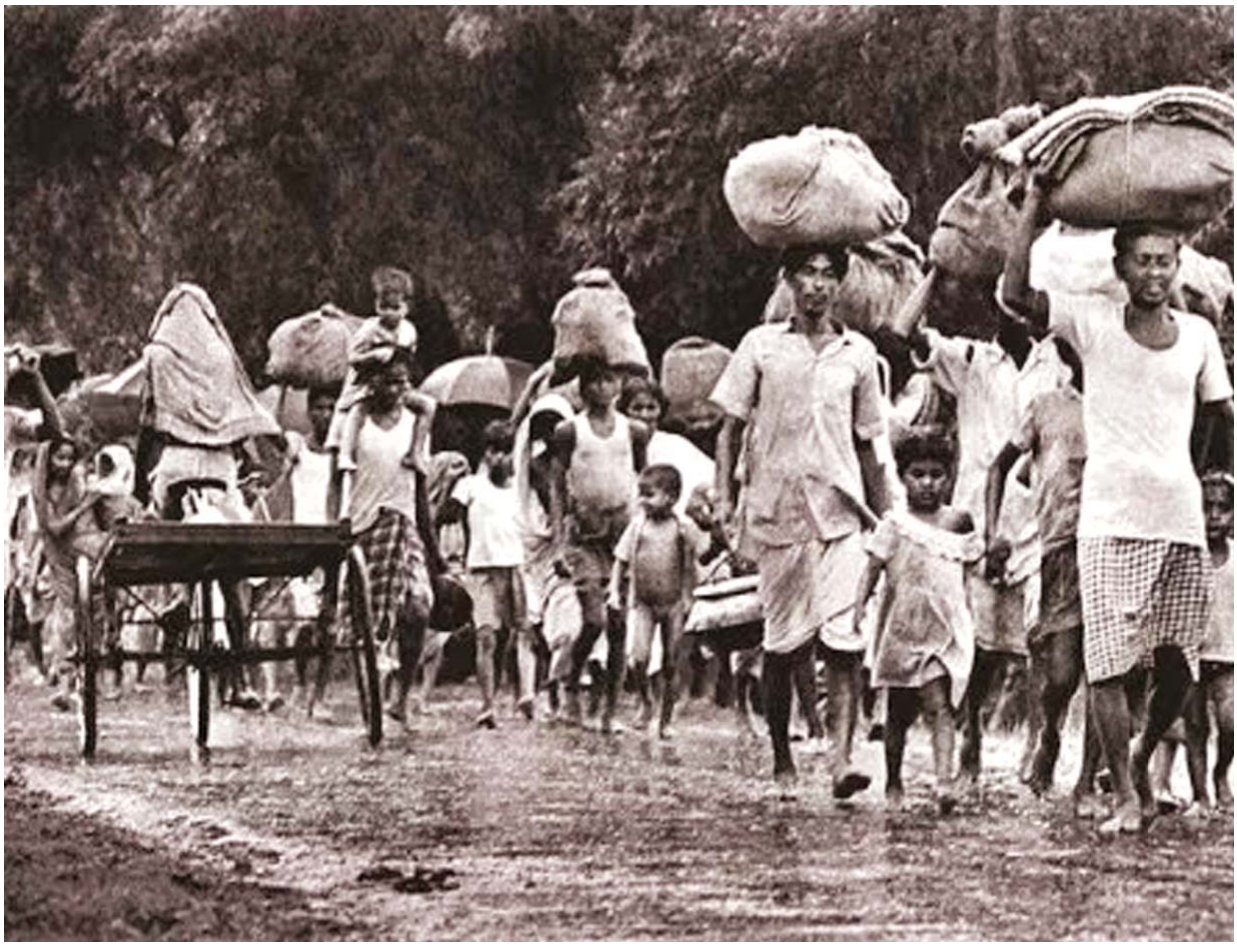

ওর শরীর পানির মুখ দেখেনি।

-হায় হায়! কার সোনামানিক, যাদুমনিরে! মা কই, বাপ কই, ভাইবোন? বলতে বলতে বারান্দার মাটিতে বসে ছেলেটার মাথাটাকে মা নিজের ভাঁজ করা হাঁটুর উপর পরম যত্নে তুলে নেয়।

আগে ছেলেটাকে একটু দেখ বৌমা, কী হয়েছে তার। দাদিরও যেন তর সইছে না।

মাথায় পানি ঢেলে চোখেমুখে পানি দেওয়ার পর ছেলেটার হুঁশ আসে। চোখ খোলে। খেতে দেয়। ছেলেটা উঠে বসে। আস্তে আস্তে দাদু-দাদি, মা-বাবা ছেলেটার কাছ থেকে সবকিছু জেনে নেয়। বাড়িতে কেউ নেই। মাকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেছে। বাড়িতে রাজাকার রহিমুদ্দি মিলিটারিকে সাথে করে এনেছে। বাবা বাধা দিতে গেলে, তারই সামনে গুলি করে মেরে ফেলে বাবাকে- বলতে বলতে কেঁদে ফেলে সে।

তার নাম জানা হলো। সুরুজ মিয়া। পড়ে ক্লাস এইটে। সবাই মিলিটারির অত্যাচারে-ভয়ে পালাচ্ছে। তাদের সাথে সুরুজ মিয়াও সঙ্গী হয়। লক্ষ্য সীমান্তের ওপার। জমির চাচার মতো যুদ্ধ করবে সে। ও বাবার কাছে শুনেছে কলেজ পড়ুয়া জমির চাচা যুদ্ধে গেছে। সীমান্তের ওপারে ট্রেনিং নিতে গেছে। সেও ট্রেনিং নেবে। তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেবে। রাজাকার রহিমুদ্দিকে ছাড়বে না কোনোদিন।

-তুমি তো এখনো ছোটো। তুমি কি যুদ্ধ করতে পারবে?

দাদার প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় কণ্ঠের দীপ্ত উচ্চারণ তার- পারব। অবশ্যই পারব। আমার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নেব আমি। আমার মা'র--- আর বলতে পারল না, আবারো কেঁদে ফেলে সুরুজ মিয়া।

পরদিন যাওয়ার সময় তার কালো থলের ভেতর থেকে লাল কাপড়ে বাঁধা পুটলিটা মায়ের হাতে তুলে দেয়।

-এটা রাখুন।

-এটা কী?

-আমার মায়ের গয়না। সোনার গয়না। আপনি রাখুন। বেঁচে থাকলে, ফিরে এসে নিয়ে যাব। বলেই ছেলেটা মানুষের ঢলে মিশে যায়। রামগড় বর্ডারের উদ্দেশে, উত্তর দিকে।

যুদ্ধ শেষ। দেশ স্বাধীন হলো। অনেক বছর পার হলো। দাদা-দাদি গত হলো। এরপর গত হলো এখন থেকে সাত বছর আগে বাবাও। ছেলেটা, মানে সুরুজ আজও আসেনি। মা, এত বছর পরও তার লাল কাপড়ে বাঁধা পুটলিটা অতি যত্নসহকারে আগলে রেখেছে। মা'র বিশ্বাস -সুরুজ আসবেই। ছেলেটা বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গেছে তার মায়ের গয়নাগুলো। তার বিশ্বাসে আমি দৃঢ়তা দেখেছি। সে আসবেই। চৌষট্টি বছর বয়সে আজও বুড়ো আমার এই মা সুরুজের গহনার পুটলিটা আগলে রেখেছে, যদি সে আসে, এই আশায়, এই বিশ্বাসে। ■

স্মৃতিকথা

আমার চোখে বঙ্গবন্ধু

জয়িতা শিল্পী

স্কুল জীবনে কখন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাম মনে গেথে গিয়েছিল তা ঠিক মনে নেই। তবে জাতির পিতার ছবিটি বুকের মধ্যে আগলে রেখেই বড়ো হয়েছি। পাঠ্য বইয়ের বাইরে কোনো বই কেনার সুযোগ হয়ে থাকলে মুজিবের বই কেনার ঝোঁক ছিল বেশি, ছোটোদের শেখ মুজিব, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু-এসব বইগুলো সংগ্রহে ছিল। পড়তাম আর বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকতাম মনে মনে। কাউকে সেসব কথা কখনো বলিনি। স্কুলে রচনা লিখতে গিয়ে প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নাম লিখেছিলাম মনে আছে। কেউ শিখিয়ে দেয়নি। বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসতে শিখিয়ে দিতে হয় না। যে ব্যক্তিত্ব জাতির পিতার তা খুব ছোটোবেলায়ই তাঁর চরিত্রে ধরা পড়ে, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ তাঁর স্কুল জীবন থেকে ঘটতে থাকে। যে মহানায়ক বাংলাদেশের স্রষ্টা তাঁকে চিনতে পারা, তাঁকে উপলব্ধি করা খুব প্রয়োজন, স্কুল জীবনে জাতীয় সংগীত গাইতে গিয়ে যে সোনার বাংলাকে ভালোবাসতে শিখি সে সোনার বাংলা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বাবার বদলি সূত্রে বাগেরহাট থেকে যশোরে গিয়েছি। বেজপাড়াতে আমাদের বাসা। আমরা তিন বোন ভর্তি হয়েছি মধুসূদন তারাপ্রসন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে। আমাদের বাসা থেকে স্কুল কাছে ছিল, হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম। আমার পরের বোনটি ক্লাস ফোর এবং ছোটো বোনটি ক্লাস টু-এ পড়ে। আমার বাবা-মায়ের ইচ্ছে ছিল আমাদের গানবাজনার মধ্যে মানুষ করার। আমার দাদুবাড়ির সবাই গান পাগল ছিল, সকাল বেলায় কীর্তন গান করা, গলা সাধা এগুলো নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। আমাকে ক্লাস ফোরে গানের মাস্টারের কাছে দেওয়া হলো। ক্লাসিকাল থেকে দেশের গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত শেখা শুরু। যশোরে এসে ভর্তি হলাম কিংশুক সংগীত একাডেমিতে। খুব ভালো লাগত গান শিখতে। ঐ সময় ভাবতাম গান শিখে অনেক বড়ো হব। পারিনি বড়ো হতে। আমার গানের স্কুলের এক শিক্ষক আমাকে নিয়ে গেলেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটে। বিভিন্ন জাতীয় দিবসকে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠান হতো। আমি অংশগ্রহণ করতাম। তখন থেকে প্রাণে গেথে গেল 'জয় বাংলা বাংলার জয়', 'শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি,

প্রতিধ্বনি, আকাশে বাতাসে ওঠে রণি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ'। এই গানগুলো গাইতাম খুব জোশের সাথে আর আনন্দ অনুভব করতাম। যশোর থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পুনরায় বাবার বদলি সূত্রে শেরপুর জেলায় চলে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে শেরপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হই। কঁচিকাচার আসর ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ি। কীভাবে যেন যারা সংগীত সাধনা করেন এরকম অনেক গুণীজনের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়, সখ্য গড়ে ওঠে অনেকের সাথে। আজও মনে পড়ে ক্ষমা চক্রবর্তী নামের একজনকে, তখন তিনি শেরপুরের একটি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। আমি তাকে পিসি বলে ডাকতাম। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি যোগ দেই উদীচী শিল্পগোষ্ঠীর সাথে। উদীচীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রেমে পড়ি কবিতার সঙ্গে কী শক্তি নিয়ে আবৃত্তি করতাম।

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু...

কিংবা

ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।

সেই দিনগুলো আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হয়েই আজকের এই আমি। আমরা অনুশীলন করতাম কমরেড 'রবি নিয়োগীর' বাসায়। আমরা তাঁকে দাদু বলে ডাকতাম। দাদু একটি চাদর জড়িয়ে বসে থাকতেন। আমাদের গান শুনতেন আর উৎসাহ দিতেন। আজ আবার স্মরণ করছি তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ভরে। কত সৌভাগ্য আমার, কমরেড রবি নিয়োগী যিনি আন্দামান দ্বীপে নির্বাসনে কাটিয়েছেন, তাঁর মতো মানুষের সাহচর্য পেয়েছি জীবনে। তাঁর পায়ের ধূলি নিতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি।

শেরপুর যতদিন ছিলাম গান, আবৃত্তি, পড়াশুনা সব নিয়ে মেতেছিলাম। শেরপুর কলেজে একবার ১৫ই আগস্ট উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগিতা হলো। শিরোনাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিলাম বলে পুরস্কার বিতরণীর দিন প্রবন্ধটি পাঠ করতে হয়েছিল। সেদিনের যে কী ভালো লাগা অনুভূতি বোঝাতে পারব না। মনে হয়েছিল আমি অনেক বড়ো কিছু জিতেছি। সেই লেখাটি কোথাও না কোথাও লুকানো আছে। আমার কলেজ জীবন, আমার উদীচীর সময়, সংগীত, আবৃত্তি নিয়ে মেতে থাকা সেই সব স্মৃতি আজও আমাকে নিয়ে যায় গীর্দ্দা নারায়ণ পুরের সেই পুকুর ঘাটলায়, কানু মাস্টারের বাড়িতে রিহার্সেলে কিংবা শহিদমিনারে।

ছোটোবেলা থেকে আমি স্বভাবে শান্ত ছিলাম। কিন্তু অন্যদের অ্যাকটিভিটিস খেয়াল করতাম। একদিন কলেজের এক বন্ধু বলল, তোমার বুকের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর একটি বড়ো ছবি বাঁধানো আছে সেটা বোঝা যায়। তুমি এসো, আমাদের সঙ্গে কাজ করো। আমি উত্তরে বলেছিলাম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমার বুকের মধ্যেই থ াক। আজও লালন করি সেই স্বপ্ন। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে ঢাকায় এলাম তখন বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বর বাড়িতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেটিও কোনো এক ১৫ই আগস্ট। চোখের জল আটকে রাখতে পারিনি সেদিন। অঝোর ধারায় কেঁদেছিলাম, ভলান্টিয়ারদের মুখে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বর্ণনা শুনে। বঙ্গবন্ধুর সব স্মৃতি, তাঁর শোবার খাট, চশমা, কলম ইত্যাদি দেখে। আবেগ ধরে রাখতে পারিনি সিঁড়ির কাছে গিয়ে। হু হু করে কেঁদে উঠেছিলাম। সেদিন অনেকের মধ্যে কান্নার রোল দেখেছিলাম। সেটি ছিল আমার আরেকটি স্বপ্ন পূরণ, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি দেখা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় অনেকবার গিয়েছি ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। এখনো যাই ডিউটি করতে, যতবার যাই নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করি। মনে পড়ে যায় শেখ রাসেলের হাসিমাখা ছোট্ট মুখটি। সবাইকে হারিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বেঁচে আছেন দেশরত্ন হিসেবে সেটিই তো আশ্চর্য! বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকে পাওয়া শিক্ষা শেখ হাসিনার প্রাণশক্তিকে অটুট রাখুক। সকল অশুভ শক্তি দূর করে সুন্দর আগামী উপহার পাক জাতি। উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন লালন করি আমরা। সেই স্বপ্ন সফল করতে সকলের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত হোক। নতুন প্রজন্ম জানুক মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস। নতুন প্রজন্ম জানুক বঙ্গবন্ধু একটি নাম। নতুন প্রজন্ম জানুক বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন। নতুন প্রজন্ম জানুক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু।

কলেজ জীবনে উদীচী শিল্পগোষ্ঠী আমাকে দেশপ্রেম শিখিয়েছে। শুধু সুর ও সংগীতকে ভালোবাসা নয়, দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি সুরের মধ্য দিয়ে। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি–এসব গান গাইতে এখনো উৎসাহ বোধ করি। এছাড়া কত গণসংগীত। এসব গান গাইতে গাইতে নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখেছি, মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছি। 'মানুষ' শব্দটি নিয়ে তখন থেকেই ভাবতে শিখেছি, মানুষ কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের বিষয়গুলো ফুটে ওঠে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতিতে সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব। একটি ঘটনা আজও মনে দাগ কেটে আছে। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কোনো একটি দিন। আমরা সপরিবারে শেরপুর ছেড়ে ঝিনাইদহ জেলায় চলে আসব বাবার বদলি সূত্রে। আমার জন্য বিদায় সংবর্ধনা আয়োজন করেছে উদীচী। মনে আছে আমি তখন একটি ছোট্ট মেয়ে। কমরেড রবি নিয়োগী দাদুর বাড়িতে অনুষ্ঠান। সকলেই আমার গুরুজন। তবুও যে শ্রদ্ধার্ঘ্য আমাকে নিবেদন করলেন তাঁরা আমি এই ভার বহনের উপযুক্ত নই। দু-হাত ভরে ফুল দিয়ে আমাকে ঢেকে দিলো উদীচীর আশীর্বাদক বন্ধুরা। আমাকে গীতাঞ্জলি বইটি উপহার দেওয়া হয়েছিল। যে বইয়ের প্রথম পাতায় সকলের নাম স্বাক্ষর করা এবং মধ্যে লেখা ছিল 'মোরা যাত্রী একই তরণির' এই ছোটো একটি বাক্য আমাকে বহুবার ভাবিয়েছে। সত্যিই তাই, যারা সংস্কৃতিকে ভালোবাসে, যারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসে, যারা দেশকে ভালোবাসে তারা সকলেই একই তরণির যাত্রী।

আমি আমার পরিবারের সঙ্গে চলে এলাম ঝিনাইদহ জেলায়। আমার বোনেরা কলেজে ও স্কুলে ভর্তি হলো। আর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছি। সুযোগ আমাকে পেতেই হবে। ঢাকায় গেলে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি দেখা হবে, আরো কত কী স্বপ্ন ! এই স্বপ্ন পূরণের জন্যই দিনরাত পরিশ্রম করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া আমার জীবনের একটি প্রাপ্তি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে জীবনে অনেক কিছু পাইয়ে দিয়েছে।

স্বাধীনতার এত বছর পরেও গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহিদদের ও দুই লক্ষ মা-বোন যারা সম্ভ্রম হারিয়েছেন। স্মরণ করি বঙ্গবন্ধুকে যে মহানায়ক আমার পথপ্রদর্শক, যে নেতৃত্ব আমাকে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়, যে দেশপ্রেম আমাকে কাজের অনুপ্রেরণা জোগায়, যে মহামানব স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি তাঁকে হাজারো সালাম। ■

বঙ্গবন্ধুর জীবনে প্রথম

মেজবাউল হক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছোটোকাল থেকেই বেড়ে উঠেছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সাহসী নেতৃত্বদান প্রভৃতি গুণে। সেজন্য তিনি ছোটো-বড়ো সবার কাছে ছিলেন প্রিয় মানুষ। যতদিন বেঁচে ছিলেন, ভেবেছেন দেশ ও মানুষের কথা। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু 'প্রথম' ঘটনা তোমাদের জানাচ্ছি বন্ধুরা–

প্রথম স্কুল

শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম স্কুলে ভর্তি হন ১৯২৭ সালে, সাত বছর বয়সে। টুঙ্গিপাড়ার গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোটো দাদা খানসাহেব শেখ আবদুর রশিদ। এটিই ছিল ওই এলাকার একমাত্র ইংলিশ স্কুল। অবশ্য এই স্কুলে খুব বেশিদিন পড়েননি বঙ্গবন্ধু। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবা তাঁকে নিজের কর্মস্থল গোপালগঞ্জে নিয়ে যান, ভর্তি করে দেন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে।

প্রথম পদ

১৯৩৭ সাল। বঙ্গবন্ধুর প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবদুল হামিদ। পরোপকারী মানুষটি অসহায় ও দরিদ্র মুসলমান ছেলেমেয়েদের সাহায্য করার জন্য 'মুসলিম সেবা সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। প্রতি রবিবার সমিতির সদস্য বঙ্গবন্ধু ও অন্যরা থলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল সংগ্রহ করতেন। হঠাৎ-ই যক্ষ্মায় মারা যান হামিদ মাস্টার। সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব নেন শেখ মুজিব। তখন মুজিবের বয়স ১৭। এক হিসেবে এটাই বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রথম কোনো পদ।

প্রথম কারাভোগ

১৯৩৮ সালের মার্চ বা এপ্রিলের এক সন্ধ্যায়। গোপালগঞ্জের খন্দকার শামসুল হক ছুটে এসে জানালেন, মালেককে হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হচ্ছে। আবদুল মালেক শেখ মুজিবুর রহমানের সহপাঠী। শেখ মুজিব দেরি না করে কয়েকজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। মালেককে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বিপক্ষ দল শুনল না। তখন শেখ মুজিব খবর দিয়ে দলের ছেলেদের ডেকে আনলেন। দুই দলে মারামারি হলো। এ ঘটনায় খন্দকার শামসুল হককে করা হলো হুকুমের আসামি। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগও বেশ কড়া। শেখ মুজিবুর রহমানকে সরে পড়ার সুযোগ দিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি।' নিজেই থানায় গিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন। এসডিও বঙ্গবন্ধুকে জামিন দিলেন না। জেলে যেতে হলো তাঁকে। সাতদিন পর জামিন পান বঙ্গবন্ধু। এটা তাঁর জীবনের প্রথম জেল। তখন তাঁর বয়স ১৮।

প্রথম ভাষণ

১৯৩৭ সালের এক উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে খাজা নাজিমউদ্দিন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মওলানা আকরম খাঁ একটা আপোশের চেষ্টা করলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীও একটু নরম হলেন। ঠিক হলো, কলকাতা অ্যাসেম্বলি পার্টি রুমে হবে আপোশ সিদ্ধান্ত। খবর শুনেই দুই-তিনশ ছাত্র জোগাড় করে সেখানে হাজির হলেন বঙ্গবন্ধু। তখন রুদ্ধদ্বার সভা চলছিল। বঙ্গবন্ধু দরজার সামনে গিয়ে বললেন, 'আমাদের কথা আছে, শুনতে হবে।' নেতারা এক পর্যায়ে দরজা খুলে দিতে বাধ্য হলেন। ছাত্ররা ভেতরে গিয়ে বসল। বঙ্গবন্ধুই সূচনা করলেন। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিলেন। ধরে নেওয়া হয় এটিই বঙ্গবন্ধুর প্রথম ভাষণ।

প্রথম পেশা

ভগ্নিপতি আবদুর রবকে নিয়ে চল্লিশের দশকে কলকাতার পার্ক সার্কাসে একটা রেস্তোরাঁ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে আব্দুর রব রেস্তোরাঁটি বিক্রি করে দেন। এরপর বঙ্গবন্ধু ইত্তেহাদের পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি হিসেবে চাকরি করতেন মাসে প্রায় ৩০০ টাকা বেতনে।

পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে নিউমার্কেটের সামনে একটি স্টেশনারি দোকানও দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। নাম রেখেছিলেন 'পূর্বাণী'। নিজের উপার্জনের অর্থ দিয়ে জনগণের সেবা করার জন্যই এ দোকান দিয়েছিলেন। এরপর পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে বঙ্গবন্ধুকে আলফা ইনসিওরেন্স কোম্পানির ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেন ইউসুফ হারুণ। মাসিক বেতন ছিল দুই হাজার টাকা।

প্রথম বিদেশ

১৯৫২ সালে চীনের পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক রিম পিস কনফারেন্সে যোগ দিতে প্রথম বিদেশ যান বঙ্গবন্ধু। উড়োজাহাজে করে প্রথমে যান রেঙ্গুন। সেই হিসেবে রেঙ্গুন বঙ্গবন্ধুর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। এরপর থাইল্যান্ড, হংকং, কৌলুন, সেনচুন হয়ে পিকিং পৌঁছান। পিকিং-এ শান্তি সম্মেলনে অংশ নেওয়া ছাড়াও বেশ কিছু দর্শনীয় জায়গা দেখেন। শান্তি সম্মেলনে বাংলা ভাষায় বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু, এ কারণে তাঁকে অভিনন্দিত করেন পশ্চিমবঙ্গের লেখক মনোজ বসু। সম্মেলনের পর বঙ্গবন্ধু কয়েকদিন ঘুরে বেড়ান চীনের বিভিন্ন জায়গায়।

প্রথমবার সংসদ সদস্য

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জের প্রার্থী নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। গোটা পূর্ব বাংলায় নির্বাচনি কাজ নিয়ে তখন বঙ্গবন্ধু এতই ব্যস্ত ছিলেন যে নিজের নমিনেশনটা পর্যন্ত জমা দিতে গোপালগঞ্জ আসতে পারছিলেন না। কয়েকটা সাইকেল আর মাইক্রোফোন ছিল তাঁর প্রচারণার সম্বল। এগুলো নিয়েই মাঠে নেমে পড়লেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কাজ করায় অনেককে গেফতারও করা হলো। তবে কিছুতেই কিছু হলো না। নির্বাচনে ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তখন তাঁর বয়স ৩৪।

প্রথমবার মন্ত্রী

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে একটি কর্মীসভায় বঙ্গবন্ধু টাঙ্গাইলে বক্তৃতা করছিলেন, তখন একটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানতে পারেন তাঁকে দ্রুতই ঢাকা যেতে হবে। মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলাপ করে ঢাকা চলে এলেন বঙ্গবন্ধু। শেরেবাংলা তাঁকে বললেন, 'তোকে মন্ত্রী হতে হবে। আমি তোকে চাই, তুই রাগ করে না বলিস না। তোরা সকলে বসে ঠিক কর, কাকে কাকে নেওয়া যেতে পারে।'

উত্তরে মুজিব বললেন, 'আমাদের তো আপত্তি নাই। শহীদ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁর অনুমতি দরকার।'

অসুস্থ সোহরাওয়ার্দী অনুমতি দেন। ভাসানীও সম্মত। আরো কয়েকজনের সঙ্গে শপথ নিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় যুক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁকে দেওয়া হলো সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রণালয়। মন্ত্রিসভার সবচেয়ে কম বয়সের সদস্য ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তখন তাঁর বয়স মোটে ৩৪। ■

[তথ্যসূত্র : শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী,' এস এ করিমের 'শেখ মুজিব ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্র্যাজেডি,' দেবব্রত দেব রায়ের 'বঙ্গবন্ধুর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা' ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা']

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশ বিশেষ

'প্রধানমন্ত্রী হবার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। অত্যাচার নিপীড়ন এবং কারাগারে নির্জন প্রকোষ্ঠকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু জনগণের ভালোবাসা যেন আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে।'

(বঙ্গবন্ধু; এম.এন.এ ও এম.পি.এ-দের শপথবাক্য-পাঠ অনুষ্ঠানে, রেসকোর্স ময়দান, ঢাকা, ৩রা জানুয়ারি, ১৯৭১)

'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। সে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব'

(বঙ্গবন্ধুর ২৬শে মার্চ, ১৯৭২-এর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ থেকে)

'বাংলার মানুষকে আমি জানি। আমাকেও বাংলার মানুষ চেনে। বাংলার মানুষকে আমি ভালোবাসি। বাংলার মানুষ আমাকে ভালোবাসে। আমি তাদের জন্য কোনো কাজে হাত দিয়ে কখনো হাল ছাড়ি না।'

(বঙ্গবন্ধু; সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ৭ই জুন, ১৯৭২)

নিবন্ধ

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কিছু

শাহানা আফরোজ

ছোট্ট বন্ধুরা, আমাদের সবারই কিছু প্রিয় জিনিস আছে। প্রিয় মানে স্পেশাল। আমাদের মতো জাতির পিতারও প্রিয় কিছু বিষয় আছে, যা তোমাদের জন্যে–

প্রিয় কবি

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কবি ছিলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা বই-এ তাই বারবার উঠে এসেছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার লাইন। পাকিস্তানের জেলখানা থেকে দেশে এসেই ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন শেখ মুজিবুর রহমান তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্গমাতা' কবিতার 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি'

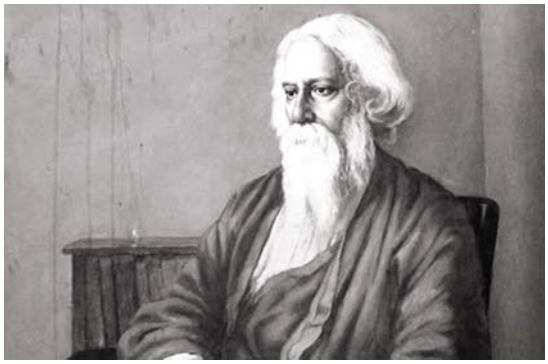

লাইন দুটি উদ্ধৃত করে বলেন, 'কবিগুরু আজ মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। আমার বাঙালি আজ মানুষ।'

একই ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি'র 'নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি! গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি' লাইনগুলো বলে তাঁর দেশে ফিরে আসার অনুভূতি প্রকাশ করেন। এসব থেকে অনুমান করা যায়, বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তাই তো ১৯৭২ সালে অসুস্থ কবিকে কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধুর আগ্রহেই কবির 'চল্ চল্ চল্' পেয়েছে জাতীয় রণসংগীতের মর্যাদা। স্বাধীন দেশে প্রথম নজরুলজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নজরুল একাডেমির স্মারকগ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লেখেন, 'নজরুল বাংলার বিদ্রোহী আত্মা ও বাঙালির স্বাধীন ঐতিহাসিক সত্তার রূপকার।'

প্রিয় গায়ক

বঙ্গবন্ধু গান শুনতে ভালোবাসতেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তার চমৎকার বর্ণনা আছে। জেলেও নিয়মিত গানের আসর বসাতেন 'কারাগারের রোজনামচা'য় তার একাধিক উল্লেখ আছে। সেখানে ফণী নামের একজনের গান শুনতেন প্রায় প্রতিদিন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার কৃষ্ণনগরে রফিকুল হোসেন এক সভার আয়োজন করেন। সেখানে বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীন আহমদ, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন আহমদ গান গাইবেন। আমরা উপস্থিত হয়ে দেখলাম, আব্বাসউদ্দীন সাহেবকে দেখার জন্য হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়েছে। আব্বাসউদ্দীন সাহেব, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন সাহেব গান গাইলেন। অধিক রাত পর্যন্ত আসর চলল। পরের দিন নৌকায় আমরা রওনা করলাম। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের ভাটিয়ালি তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলোও যেন তাঁর গান শুনছে। আমি আব্বাসউদ্দীন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

শেখ মুজিব আরো দুজন গায়ককে পছন্দ করতেন। রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী জাহিদুর রহিম ও আধুনিক গানের শিল্পী আবদুল জব্বার। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গায়ক

জাহিদুর রহিমকে 'বাবু' বলে ডাকতেন বঙ্গবন্ধু। এক সাক্ষাৎকারে আবদুল জব্বার বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'পাগলা, একটা গান বানা তো।' ফজল-এ-খোদা লিখেছিলেন, 'সালাম সালাম হাজার সালাম, সকল শহিদ স্মরণে'। সুর করে বঙ্গবন্ধুকে শোনালাম। উনি শুনে বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, 'তুই কী চাস বল।' বললাম, সারা জীবন গানই গাইতে চাই। উনি আমাকে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'পাগলা, তুই গানই গা সারা জীবন।'

প্রিয় রাজনীতিবিদ

আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আব্রাহাম লিংকন, মাও সে-তুং, ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন, উইনস্টন চার্চিল, জন এফ কেনেডি, কামাল আতাতুর্ক ও সুকর্ণ রাজনীতিবিদ হিসেবে সবার প্রতি ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর শ্রদ্ধা। এই উপমহাদেশের মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও ছিলেন এই তালিকায়। তবে তাঁদের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিঃসন্দেহে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্তরের মানুষ। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' শুরুর ১০ লাইনের মধ্যেই সোহরাওয়ার্দীকে স্মরণ করেছেন তিনি।

১৯৩৮ সালে বঙ্গবন্ধুর বয়স যখন ১৮, তখন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন সোহরাওয়ার্দী, হয়ে ওঠেন তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। সোহরাওয়ার্দীর শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে অবস্থানকালেও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লন্ডন গেছেন বঙ্গবন্ধু।

ফজলে লোহানীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তিনি আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন।' এই রকম অনেক ঘটনা থেকে বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর প্রিয় রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

প্রিয় লেখক

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লেখক কে? বলা কঠিন। কারণ তিনি পাঠানুরাগী মানুষ ছিলেন। বাংলা ভাষার চিরায়ত লেখকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় পাঠ্য ছিল রবীন্দ্র-শরৎ-নজরুল। আর সমসাময়িকদের মধ্যে সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, শওকত ওসমান। পাশাপাশি পড়তেন ইতিহাসের বই ও বিপ্লবী সাহিত্য। আত্মজীবনীতেই আছে ভারতভাগ নিয়ে লেখা অ্যালান ক্যাম্পবেল জনসনের মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন -এর উল্লেখ।

বঙ্গবন্ধু এতটাই বই পাগল ছিলেন যে একবার বই না পেয়ে সোহরাওয়ার্দীকে এক চিঠিতে অনুযোগ করে লিখেন, 'অক্টোবরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেটে যখন দেখা হয়েছিল, বলেছিলেন, কিছু বই

পাঠাবেন। কিন্তু আমি কোনো বই পাইনি। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।'

প্রিয় কবিতা

১৯৬৬ সালে কারাগারে বঙ্গবন্ধু তাঁর আব্বার কাছ থেকে একটা চিঠি পান। চিঠি পড়েই তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা তৈরি হলো। 'কারাগারের রোজনামচা'য় তিনি লিখলেন, 'বারবার আব্বা ও মার কথা মনে পড়তে থাকে। মায়ের সাথে কি আবার দেখা হবে? অনেকক্ষণ খবরের কাগজ ও বই নিয়ে থাকলাম কিন্তু মন থেকে কিছুতেই মুছতে পারি না, ভালোও লাগছে না। অনেকক্ষণ ফুলের বাগানেও কাজ করেছি। মনে মনে কবিগুরুর কথাগুলি স্মরণ করে একটু শান্তি পেলাম।

> 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
> বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও 'কারাগারের রোজনামচা'য় তিনি যে কোনো সংকটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিপদে মোরে রক্ষা করো' স্মরণ করে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতেন। তাতে বলাই যায় এটি বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কবিতা।

প্রিয় খেলা

শুধু রাজনীতির মাঠ নয়, খেলার মাঠেও এক আকর্ষণীয় চরিত্র ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কৈশোরে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে পুরস্কারও পেয়েছেন।

নিজে খেলতেন বলে ফুটবল খেলাকেই বেশি পছন্দ করতেন বঙ্গবন্ধু। গোপালগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় থেকেই তিনি ফুটবল ও ভলিবল খেলতেন। তৎকালীন মহকুমা টিমে খেলার রেকর্ডও আছে বঙ্গবন্ধুর। আজীবন ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। ওয়ান্ডারার্স ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এই ক্লাবের তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

প্রিয় গান

১৯৭১ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি কোনো একদিন। সপরিবারে রাতের খাবার খেতে বসেছেন শেখ মুজিবুর রহমান। খেতে খেতে হঠাৎ সবার উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'দেশটা যদি কোনোদিন স্বাধীন হয়, তাহলে কবিগুরুর আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করো।' ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। বিমানে লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরছেন বঙ্গবন্ধু। সহযাত্রী ভারতীয় কূটনীতিক শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জি। ওমান পার হওয়ার পর দাঁড়িয়ে উঠে গাইতে লাগলেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' জলে ভরে উঠেছে তাঁর চোখ।

অনেক আগে থেকেই 'আমার সোনার বাংলা' বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গান। অনেক অনুষ্ঠানেই গানটি গাইতে বলতেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন '৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যখন শেষবারের মতো জনসভা করি, তখন ছেলেরা গানটা গাইতে শুরু করে। আমরা সবাই, ১০ লাখ লোক দাঁড়িয়ে গানটাকে শ্রদ্ধা জানাই। তখনই আমরা আমাদের বর্তমান জাতীয় সংগীতকে গ্রহণ করে নিই।' বঙ্গবন্ধুর আরেকটি প্রিয় গান ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।'

প্রিয় খাবার

ছোটোবেলায় বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খাবার ছিল ভাত, মাছের ঝোল আর সবজি। শেষে দুধ-কলা-গুড় না থাকলে যেন খাওয়াই পূর্ণ হতো না! বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন লিখেছেন, 'টেংরা, পুঁটি, পাবদা, সাদা ভাত, ডাল, করলা, মলা আর সবজি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রিয় খাবার। সবসময় এগুলো দিয়ে খেতে দেখেছি।' মাছের মধ্যে প্রিয় ছিল কই। 'কারাগারের রোজনামচা'য় লিখেছেন, 'রেণু কিছু খাবার দিয়ে গেছে। কই মাছ খেতে ভালোবাসতাম, তাই ভেজে দিয়ে গেছে।'

বঙ্গবন্ধুর আরেক প্রিয় খাবার ছিল মুড়িমাখা। 'কারাগারের রোজনামচা'য় লিখেছেন, 'আমার বাড়িতে

মায়ের হাতে খাওয়া সবসময়ই আনন্দের

মুড়ি খাবার অভ্যাস।' আরেক জায়গায় লিখেছেন, 'মুড়ি কাঁচা মরিচ, পিঁয়াজ, আদা আর সরিষার তৈল দিয়ে একবার মাখলে যে কি মজা তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না। আমার না খেলে চলে না।' এ রোজনামচার-ই অন্যত্র লিখেছেন, 'আমার মুড়ি জেলখানায় খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সিপাহি, জমাদার ও কয়েদিদের মধ্যে অনেকে পালিয়ে মুড়ি খেতে আসে।' এ থেকেই বোঝা যায়, মুড়ির বড়ো ভক্ত ছিলেন শেখ মুজিব।

জেলে থাকতে থাকতে রান্নাবান্নায়ও পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। মাঝেমধ্যেই বাবুর্চিকে সরিয়ে নিজেই রান্নায় বসে যেতেন। সময় তো কাটাতে হবে, রুচিও বদল হয়। রান্না করতে পারতেন পটল ভাজি, ইলিশ মাছ। আবার রেসিপি না জানায় নানা সময় কলিজা, ফলি মাছ, খিচুড়ি রাঁধতে গিয়ে নাকাল হতেন।

তথ্যসূত্র : শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', চিঠিপত্র ও বক্তৃতা, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'বাংলাদেশে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্রেসির লড়াই', এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' এবং মুনতাসীর মামুনের 'বঙ্গবন্ধু কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা এনেছিলেন'। ■

দেশের তাজ

ফায়েজা খানম

রোদ্রের মতো উজ্জ্বল তুমি
শীতলতার পরশও তোমাকে ছোঁয়ায়
আকাশের মতো উদার তুমি
অন্যের দুঃখ তোমাকে কাঁদায়।
পাখির গানে, নদীর টানে
দেখেছিলে পরাধীনতা,
সত্যের সাথে মোকাবেলায়
তুমি ছিলে এক মহান নেতা।
ভালোবাসার অনন্য পথিক
জন্মেছিলে গোপালগঞ্জে
মহান নেতার অকাল মৃত্যুতে
শিহরিত হই রন্ধ্রে রন্ধ্রে।
তুমি আছ দশের মধ্যে
হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে
আশার ভেলায় তুমি
নিরাপদ আশ্রয়,
তোমাতে নেই কোনো সংশয়।
তুমি তো ৭ই মার্চের ভাষণে
গর্জে ওঠা লাখো জনতার তলোয়ার,
হে অগ্রপথিক, দুর্বার কণ্ঠ তোমার
তুমি অনুপ্রেরণা, তুমি মহীয়ান।
তুমি দেশের তাজ।

নিবন্ধ

কেমন করে এল

পারভীন সুলতানা

মুজিব কোট

আত্মীয়তার সূত্রে বঙ্গবন্ধুর দূর সম্পর্কীয় দাদা ছিলেন মাওলানা শামছুল হক শেখ। তিনি ছিলেন লালবাগ মাদরাসার মুহতামিম। শেখ মুজিবুর রহমান তখন ঢাকার তরুণ নেতা। দাদাকে দেখতে প্রায়ই লালবাগে যেতেন তিনি। তাঁর সঙ্গে গভীর এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর। পাঞ্জাবির ওপরে সব সময় কালো কোট পরতেন শামছুল হক। একদিন লালবাগে তাঁর কামরায় শেখ মুজিব বললেন, 'দাদা, আপনার কোটটা আমার খুব ভালো লাগে।' সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে কোটটি খুলে মুজিবকে পরিয়ে দিলেন শামছুল হক। বললেন, 'দারুণই তো লাগছে। এখন তোমাকে সত্যিকারের নেতা মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, কোটটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। এটা পরে সবসময় মিটিং-মিছিলে যাবে।' সেই যে দাদার কালো কোট গায়ে পরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আমৃত্যু এই কোট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

বঙ্গবন্ধুর মুজিব কোটে ছয়টি বোতাম ব্যবহার করা হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র একবার এই ছয়ের রহস্য জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু তাকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'এ প্রশ্ন আগে আমাকে কেউ করেনি রে। তুই-ই প্রথম। এই ছয় বোতাম আমার ছয় দফার প্রতীক।' বঙ্গবন্ধুর মুজিব কোটের আরেকটা বিশেষত্ব, কলারের ভেতরে বোতাম দিয়ে আটকানো আলাদা কাপড়ের ডাবল কলার। কলার বেশি ময়লা হয় বলেই মনে হয় এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

ডিজাইনার বদরুন নাহার জানিয়েছেন, বঙ্গবন্ধুর প্রথম মুজিব কোটটি ছিল খাদি কাপড়ের। সেলাই করে দিয়েছিল ১৬ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের নিউ লাহোর টেইলার্স। এই টেইলার্স থেকেই সাধারণত বঙ্গবন্ধুর কাপড় সেলাই করা হতো। স্বাধীনতার পর মুজিব কোট পরেই ভাষণ দিয়েছেন, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সর্বোপরি নিজেকে বাঙালির ফ্যাশন আইকন হিসেবে বিশ্বের দরবারে হাজির করেছেন।

[সূত্র : সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহর 'হুজুর কোটটি খুলে শেখ মুজিবের গায়ে পরিয়ে দিলেন', মোহসিনা লাইজুর 'বঙ্গবন্ধুর ধ্রুপদী স্টাইল']

জয় বাংলা

১৯৭০ সালের ৭ই জুন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে 'জয় বাংলা' বলে ভাষণ শেষ করেন বঙ্গবন্ধু। এই প্রথম বড়ো কোনো সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর মুখে উচ্চারিত হলো 'জয় বাংলা'। উপস্থিত লাখ লাখ মানুষ বিপুল উল্লাসধ্বনি ও করতালির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর এই স্লোগানকে স্বাগত জানালো।

পরে '৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো বেতার-টিভিতে বক্তব্য পেশের সুযোগ পেলে এই 'জয় বাংলা' নিয়ে একটা জটিলতা সৃষ্টি হলো। বঙ্গবন্ধুর ভাষণের জন্য নির্ধারিত ছিল ২৮শে অক্টোবর। ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে 'বাংলাদেশ' ও 'জয় বাংলা' শব্দগুলো ছিল। শব্দ দুটির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আপত্তি করে। অনেক আলাপ-আলোচনার পর অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো, ভাষণে 'জয় বাংলা' বলতে পারবেন বঙ্গবন্ধু, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বদলে কিছুতেই বাংলাদেশ বলতে পারবেন না। তাই ছয় দফার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে 'জয় বাংলা' ও 'খোদা হাফেজ' বলে ভাষণ শেষ করেন বঙ্গবন্ধু। পরে নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধে এই 'জয় বাংলা' স্লোগান হয়ে ওঠে বাঙালির সঞ্জীবনী মন্ত্র। ■

[সূত্র : এম এ ওয়াজেদ মিয়ার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ']

বঙ্গবন্ধু

দেলোয়ার হোসেন

বঙ্গবন্ধু সকালবেলার সোনা আলোর রবি
বঙ্গবন্ধু সবার নেতা দেশের বড়ো কবি।

বঙ্গবন্ধু হাজার ফুলে গাঁথা একটি মালা,
স্বাধীনতা এনে দিলেন জুড়ালো সব জ্বালা।

বঙ্গবন্ধু খোদার দেওয়া একটি নতুন তারা,
বাংলা স্বাধীন হতো কি আর সেই তারাটি ছাড়া?

বঙ্গবন্ধু শান্ত সকাল আলো ভরা আকাশ,
হাজার ফুলের গন্ধ মাখা ঝিরি-ঝিরি বাতাস।

বঙ্গবন্ধু দোয়েল-শ্যামা সবুজ বনের পাখি,
সেই পাখিটা আদর মেখে বুকের খাঁচায় রাখি।

মাইশা মেহজাবিন (সুপ্তি), চতুর্থ শ্রেণি, রংধনু কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড মডেল হাই স্কুল, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

নিবন্ধ

ব্যাতিক্রমী বঙ্গবন্ধু

আরমান হোসেন

যখন অভিনেতা

১৯৭৩ সাল। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'সংগ্রাম'-এর শুটিং চলছে। সিনেমার শেষ দৃশ্যটি এমন হবে স্বাধীন দেশের সামরিক বাহিনী বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্যালুট করছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে কীভাবে রাজি করানো যায়, তাই নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন পরিচালক চাষী নজরুল ইসলাম। মুশকিল আসানের উপায় বললেন সিনেমার নায়ক খসরু। স্বাধীনতার আগে খসরু ছিলেন ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী। স্নেহের সুযোগ নিয়ে শেষ দৃশ্যের একটা ব্যবস্থা করতে চাষী নজরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর কাছে হাজির হলেন খসরু। অভিনয় করার কথা শুনে ধমক দিলেন বঙ্গবন্ধু। ধমক খেয়েও পিছু হটলেন না তারা দুজন। বঙ্গবন্ধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নানের সাথে আলাপ করলেন। অবশেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধে রাজি হলেন তিনি। খসরুকে বললেন, 'যা, করে দেব।'

সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পিলখানায় শুটিংয়ের ব্যবস্থা হলো। মার্চপাস্টের বিশাল আয়োজন। এক চান্সেই শট ওকে করতে হবে। একবার মিস হলে সব শেষ। বঙ্গবন্ধু মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। পেছনে সারি বেঁধে বসালেন সেনাবাহিনীর সব শীর্ষ কর্মকর্তাদের। মঞ্চের সামনে প্যারেড করে স্যালুট দিয়ে এগিয়ে চলেছে সুসজ্জিত সেনাদল। পরিচালকের কথামতো স্যালুট নিতে কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বঙ্গবন্ধু। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অধৈর্য হয়ে পরিচালককে এক ধমক, 'এই, কতক্ষণ হাত তুইলা রাখব রে।'

চাষী : আর অল্প কিছুক্ষণ।

বঙ্গবন্ধু : আরে কী করস না করস তোরা।

এভাবেই ধারণ করা হলো 'সংগ্রাম' ছবির শেষ দৃশ্য।

[সূত্র : চাষী নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার]

ফটোগ্রাফিক মেমোরি

বঙ্গবন্ধুর ছিল তুখোড় স্মৃতিশক্তি, যাকে বলে ফটোগ্রাফিক মেমোরি। একবার যাকে দেখতেন বা যার সঙ্গে পরিচয় হতো তাকে আর ভুলতেন না। ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গার আগে সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয়। ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিক হিসেবে এসে পেছনের সারিতে বসেছিলেন নিখিল। বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাঁকে ঠিকই চিনেছিলেন, 'এই, তুই নিখিল না?'

রমনা এলাকার গণভবনের আরেকটি ঘটনা। এক যুবক এল, তার একটা চাকরি দরকার। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এই, তোর বাড়ি কোথায়?'

যুবকটি খুলনার একটা এলাকার নাম বলল। তখন তার বাবার নাম জিজ্ঞেস করলেন। নাম শুনেই তার মায়ের নাম বলে দিলেন; জানতে চাইলেন, 'একথা তোর মা কি আগের মতো এখনো পিঠা তৈরি করে?'

শুনে ছেলে চাকরির আরজি করবে কি, কেঁদেই অস্থির।

আরেক দিনের ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য গণভবনে এসেছেন এক বৃদ্ধ। পরনে লুঙ্গি-পাঞ্জাবি দেখে পাহারারত পুলিশ তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। ভদ্রলোক গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় বাইরে থেকে বঙ্গবন্ধুর গাড়ি এসে ঢুকল। গাড়ির সামনের আসনেই বঙ্গবন্ধু বসা। গেটের পাশে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দাঁড়ানো দেখেই গাড়ি থামাতে বললেন বঙ্গবন্ধু। গাড়ি থেকে নেমে ভদ্রলোককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর তাঁকে পাশে বসিয়ে গণভবনে নিয়ে গেলেন।

গণভবনের ভেতরে একটি রুমে কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। পরে ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত সবাইকে বললেন, 'আপনারা এই ভদ্রলোককে গণভবনের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিয়েছেন। কারণ তাঁর অতীত আপনাদের জানা নেই। কিন্তু আমার কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান ব্যক্তি। গ্রেফতারের জন্য পাকিস্তানি পুলিশ যখন হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তখন নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে তাঁর বাসায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তাঁর এই ভালোবাসার কথা, এই উপকারের কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তবে তাঁর বর্তমান অবস্থা দেখে আমি খুব কষ্ট পেয়েছি।' এরপর ভদ্রলোককে ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। ■

সূত্র : মাসুম বিল্লাহর 'আমাদের সুপারম্যান বঙ্গবন্ধু' ও মহিবুল ইজদানী খান ডাবলুর 'কাউকে দেখলে কোনদিন ভুলতেন না বঙ্গবন্ধু'

শুভ জন্মদিন

আবির মাহমুদ

বিশ্বজুড়ে সবার কাছে
প্রিয় একটি নাম
তিনি হলেন জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৭ই মার্চ শুভ জন্মদিনে
জানাই তাঁকে হাজারো সালাম
তাঁর সুনিপুণ নেতৃত্বে
সোনার বাংলাদেশ পেলাম।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত সাইকেল

রায়হান সাইফুর চৌধুরী

একটি বাইসাইকেল। বহু বছরের পুরনো। এর কিছু কিছু যন্ত্রাংশ ভেঙেও গেছে। এটি ব্যবহারের উপযোগিও নয়। কিন্তু তাতে কী। এই পুরোনো সাইকেলটিকে ঘিরে রয়েছে মানুষের বিপুল উৎসাহ। এই বাইসাইকেলটি আর সাইকেল হয়ে নেই। এটি ইতিহাসের অমূল্য স্মারক হয়ে উঠেছে। কারণ এই বাহনের সাথে যে জড়িয়ে আছে আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি।

আমি জানি তোমাদের খুব জানতে ইচ্ছে করছে এই সাইকেলের ইতিহাস। তাহলে শেনো–

এই সাইকেলটির মালিক রাজবাড়ি জেলার মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল ওয়াজেদ মণ্ডল। ইংল্যাণ্ডের ডানলপ কোম্পানির এই সাইকেলটি। তিনি ১৯৪৮ সালে মাত্র ২২০ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী ওয়াজেদ চৌধুরীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে রাজবাড়িতে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন ওয়াজেদ চৌধুরী। তাঁর বাড়ি থেকেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন শেখ মুজিব। মোল্লা জালাল, ওবায়দুর রহমান ও মোনাস্কাসহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতা প্রচারে অংশ নেন। গ্রামের উঁচু নিচু রাস্তা তাই তারা ১০/১২ জন সাইকেল নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শেখ মুজিবুর রহমানের সাইকেলটি নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থায় মোনাক্কা চেয়ারম্যানের বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় সেখানে ওঠেন সবাই। (মোনাক্কা ছিল সাইকেলের মালিক ওয়াজেদ মণ্ডলের চাচাত ভাই। সাইকেলটি নিয়ে সে তখন বেড়াতে আসে চাচাত ভাইয়ের বাড়ি)। ওই সময় বঙ্গবন্ধু লিচু গাছে হেলান দেওয়া একটি সাইকেল দেখতে পান। তখন বঙ্গবন্ধু জানতে চান সাইকেলটি কার। ওয়াজেদ মণ্ডল সেখানে ছিলেন। জবাবে ওয়াজেদ মণ্ডল বলেন, আমার ওয়াজেদ মন্ডলের বয়স ছিল তখন ১৪ বছর। পড়ত ৮ম শ্রেণিতে, নেতা তখন বলেন, 'তোর সাইকেলটি কয়েকদিনের জন্যে আমাকে দে। আমি না আসা পর্যন্ত তুই এ বাড়িতেই থাক। আমি এখানেই তোর সাইকেলটি ফেরত দিয়ে যাব'। পনেরো দিন প্রচার কাজ শেষে ফিরে আসেন নেতা। সাইকেল ফেরত দিয়ে ওয়াজেদ মণ্ডলকে জড়িয়ে ধরেন এবং বলেন, ভালো থাকিস আর মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করিস। মানুষকে ভালোবাসিস, পারলে রাজনীতিটাও করিস'।

ওয়াজেদ মণ্ডল ১৯৭২ সালে ধানমণ্ডির বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। প্রথম দেখাতেই বঙ্গবন্ধু তাকে চিনতে পারেন এবং জানতে চান সাইকেলটির খবর। তখন তিনি ওয়াজেদ মণ্ডলকে বলেছিলেন, 'আমি মরে গেলে এটি জাদুঘরে দিয়ে দিবি'?

ওয়াজেদ মণ্ডল বহু বছর বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজরিত বাইসাইকেলটিকে ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছেন। অবশেষে ২০১৬ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি ঐ ঐতিহাসিক সাইকেলটিকে জাদুঘরে প্রদান করেন। সে সময় ওয়াজেদ মণ্ডলের হাত থেকে সাইকেলটি আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস ও ধ্রুপদী শিল্পকলা এবং বিশ্বসভ্যতা বিভাগের ড. স্বপন কুমার বিশ্বাস, সমকালীন শিল্পকলা ও বিশ্বসভ্যতা বিভাগের মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, রেজিস্ট্রেশন অফিসার মো. আবু ইউনুস। ■

দেশে দেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো জানো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণীয় করে রাখতে আমাদের দেশে নির্মিত হয়েছে তাঁর ভাস্কর্য। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন স্বাভাবিক ঘটনা হলেও বিদেশের মাটিতে তাঁর ভাস্কর্য স্থাপন নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। এসো বন্ধুরা জেনে নেই সেরকম কয়েকটি ভাস্কর্যের কথা।

কলকাতার বেকার হোস্টেলে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

বঙ্গবন্ধু কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় বেকার হোস্টেলে ছিলেন ১৯৪২-৪৭ সাল পর্যন্ত। কলকাতার ঐতিহ্যবাহী সরকারি বেকার হোস্টেলের বঙ্গবন্ধু স্মৃতিকক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। এই ভাস্কর্যটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। এসময় কলকাতা এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

এই বেকার হোস্টেলেই এর আগে ২০১১ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছিল। নতুন এই ভাস্কর্যটি উন্মোচন করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশের সঙ্গে রয়েছে ভারতের এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কলকাতায় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবাহী এই ভাস্কর্যটি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। ঐতিহ্যবাহী বঙ্গবন্ধুর নতুন এ ভাস্কর্যটি তৈরি করেছেন ঢাকার শিল্পী লিটন পাল রনি। এই হোস্টেলটির অবস্থান কলকাতার শিলাইদহের কাছে স্মিথলেনে। বন্ধুরা তোমরা কখনো কলকাতায় গেলে দেখে আসতে পারো ভাস্কর্যটি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বেকার হোস্টেলে অবস্থান করেন। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে তিনি ১৯৪২ সালে ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামিয়া কলেজে। ছিলেন ২৪ নম্বর কক্ষে।

১৯৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বেকার হোস্টেলের ২৩ ও ২৪ নম্বর কক্ষ নিয়ে গড়া হয় বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি কক্ষ। সেখানে এখনো তাঁর ব্যবহৃত খাট, আলমারি, চেয়ার ও টেবিল রয়েছে।

লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

ব্রিটেনের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাস্কর্যটি লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আফসার খান সাদেকের উদ্যোগে ও নিজের অর্থায়নে তৈরি করা

হয়। পূর্ব লন্ডনের বাঙালি-অধ্যুষিত এলাকা টাওয়ার হ্যামলেটসের সিডনি স্ট্রিটে আফসার খান সাদেকের বাড়ির সামনে এটি স্থাপন করা হয়। এই ভাস্কর্যটি ২০১৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তৎকালীন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত উন্মোচন করেন।

২০০৯ সালে আফসার খান সৈয়দ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যটি তৈরির জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কাছে অনুমতি চায়। পরবর্তীতে ৫ বছর পর এটি নির্মাণের অনুমতি দেয় ২০১৪ সালে। বর্তমানে ভাস্কর্যটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য

বন্ধুরা অস্ট্রেলিয়াতেও বঙ্গবন্ধুর একটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে। এটি স্থাপন করা হয় অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনির আইন অনুষদের সামনে ২০১৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশের

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এই ভাস্কর্যটি উদ্‌বোধন করেন।

এটি তৈরি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক জালাল আহমেদের তত্ত্বাবধানে তরুণ ভাস্কর চঞ্চল কর্মকার ও মিলন পাল। ব্রোঞ্জের তৈরি ২.৬ মিটার উচ্চতায় এই ভাস্কর্যটি তৈরি করতে সময় লেগেছে দেড় মাস।

বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড়ো ভাস্কর্য

চট্টগ্রাম নেভাল একাডেমিতে নির্মাণ করা হয়েছে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সের সামনে নির্মাণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য। এটি কালো পাথরের বেদিতে সাদা মার্বেলের

ওপর স্থাপিত। এটি পরাধীনতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে বেরিয়ে আসার প্রতীক। সেখানে বঙ্গবন্ধু তাকিয়ে আছেন অবারিত দূর সমুদ্র পানে, চোখে তাঁর সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন। সেই উপলব্ধিকে বাস্তবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন খ্যাতি ভাস্কর্য শিল্পী সুদীপ্ত মল্লিক সুইডেন। বঙ্গবন্ধুর এ ভাস্কর্যটি দেশে নির্মিত সর্ববৃহৎ আবক্ষ ভাস্কর্য। সম্পূর্ণ ব্রোঞ্জের তৈরি ভাস্কর্যটির উচ্চতা ৪১ ফুট ও ওজন প্রায় ১৮ টন। এটি নির্মাণ করতে প্রায় দুইবছর সময় লাগে। ■

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করল ওয়াশিংটন ডিসি

মো. জামাল উদ্দিন

বাংলাদেশ সরকার ২০২০-২০২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন, জানো তো বন্ধুরা। তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি এ বছরের ১৭ই মার্চ থেকে আগামী বছরের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে ২রা মার্চ-এ ঘোষণাপত্র জারি করেন ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বোসা।

ঘোষণাপত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর বাংলাদেশকে ‘একটি গণতান্ত্রিক, সহিষ্ণু, বহুদলীয় ও মধ্যপন্থি দেশ’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, দেশটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’য় রূপান্তর ও বিকশিত হচ্ছে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, ‘ওয়াশিংটন ডিসির সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ দূতাবাস অবদান রেখে চলেছে।’ এদিকে মুজিববর্ষ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসীরাও নানা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

১৭ই মার্চ থেকে শুরু হবে এসব কর্মসূচি। শিকাগো সিটিতে এ উপলক্ষ্যে ২০ শে মার্চ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন সেখানকার অনারারি কনসাল।

নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে ১৭ই মার্চ প্রথম প্রহরে প্রবাসীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হবে। এরপর ২৮-২৯শে মার্চ দু-দিন ব্যাপী ‘বঙ্গবন্ধু-বাংলাদেশ কনভেনশন’ হবে নিউইয়র্ক সিটির একটি অভিজাত হোটেলের বলরুমে। নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং কমিটি ফর সেক্যুলার অ্যান্ড ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশ যৌথভাবে এর আয়োজন করেছে। ২১শে মার্চ নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনের একটি অভিজাত মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে বহুজাতিক উৎসব। জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের ব্যবস্থাপনায় এ উৎসবে জাতিসংঘের চলতি সাধারণ অধিবেশনের সভাপতিসহ শীর্ষ কর্মকর্তারা থাকবেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখা, উদীচীসহ বিভিন্ন সংগঠনের নানা কর্মসূচি রয়েছে। এসব আয়োজনে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে প্রবাস প্রজন্ম এবং বহুজাতিক সমাজের বিশিষ্টজনদের। নিউজার্সি, বোস্টন, পেনসিলভেনিয়া, ভার্জিনিয়া, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, টেক্সাস, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান কানেকটিকাটসহ বাংলাদেশি অধ্যুষিত অঙ্গরাজ্যগুলোতেও মুজিববর্ষ উপলক্ষে নানা প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। ■

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত ৭ই মার্চের ভাষণ

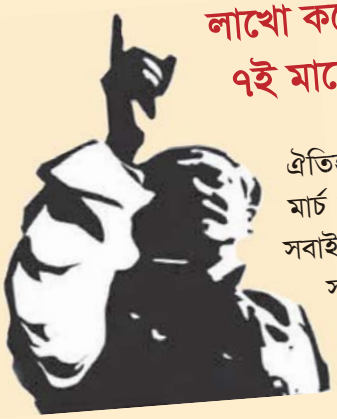

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক এক ভাষণ দেন। ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু তাঁর তর্জনী উঁচু করে ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দেন।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' - বঙ্গবন্ধুর এই কালজয়ী ভাষণ এবার ৭ই মার্চ ধ্বনিত হলো লাখো শিক্ষার্থীর কণ্ঠে। সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ভাষণটি।

ঝিনাইদহে হাজারো কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ঝিনাইদহে পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর কণ্ঠে একসাথে ধ্বনিত হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ। জেলা সদরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী এ আয়োজনে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীরা ক্ষুদে বঙ্গবন্ধু সেজে একই ভঙ্গিতে ভাষণটি উচ্চারণ করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ১৯ মিনিটের ঐতিহাসিক ভাষণ।

দিনাজপুরে লাখো কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

মাইক্রোফোন হাতে ১৬ বছর বয়সি এক কিশোর প্রান্ত গোস্বামী। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বজ্রকণ্ঠ। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কিশোরের বজ্রকণ্ঠে কণ্ঠ মিলে ধ্বনিত হচ্ছে আকাশ-বাতাস। সকলের চোখেমুখে বঙ্গবন্ধুর প্রতিচ্ছবি। প্রান্তর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় লাখো কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ঐতিহাসিক ভাষণ পাঠ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি, রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও ২২৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমবেতকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ। শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধু সেজে ৭ই মার্চ বেলা ১১টায় ভাষণটি উপস্থাপন করে।

খুলনায় শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ৭ই মার্চের ভাষণ

খুলনা বিভাগে ১৯ হাজার দুইশত জন শিক্ষার্থীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ঐতিহাসিক ভাষণটি। এতে কয়েক হাজার অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনতা অংশ নেয়। ৭ই মার্চ বেলা ৩টা ২০ মিনিটে খুলনা মহানগরীর ১২৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এটি অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

নড়াইলে হাজারো কণ্ঠে ৭ই মার্চের ভাষণ

নড়াইলে হাজারো কণ্ঠে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ উপস্থাপন করে। ৭ই মার্চ বেলা সাড়ে তিনটায় সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষার্থীরা মুজিব কোট পড়া অবস্থায় ঐতিহাসিক ভাষণটি উচ্চারিত করে।

মুজিববর্ষে দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন আদর্শ, চেতনা ও দর্শনের নাম। সোনার বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে ১৭ই মার্চ ২০২০। তাই বাংলাদেশ সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০২০-২০২১ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন। মুজিববর্ষে দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না-সেই লক্ষ্যে কাজ করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে, দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মুজিববর্ষের প্রশ্নের উত্তর দেয় রোবট

মুজিববর্ষ হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের ঘোষিত বর্ষ। ২০২০-২০২১ সালকে বাংলাদেশ সরকার মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কৃতিত্ব অর্জনকারী বরিশাল অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও উৎসাহ প্রদানে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রোবটের কথা বলা। আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শুভ কর্মকার। সে মাত্র ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে একটি রোবট তৈরি করে। যার নাম রবিন। তার নির্মিত রোবট 'রবিন' মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে-কোনো প্রশ্ন করলে সব সঠিক উত্তর দেয়।

২০০ টাকার নোট

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাজারে আসছে ২০০ টাকার স্মারক মুদ্রা ও নোট। ১৮ই মার্চে এই নোট ছাড়বে বাংলাদেশ ব্যাংক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ। ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার মতোই এবার ২০০ টাকার নোটও ছাড়া হবে। নোটটি ১০০ ভাগ কটন কাগজে মুদ্রিত। নোট-এর উপরের অংশে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবর্ষ ১৯২০-২০২০' লিখা রয়েছে। উপরের ডান কোনায় ইংরেজিতে মূল্যমান ২০০ ও ডান দিকের নিচে কোনায় বাংলায় ২০০ লেখা রয়েছে। নোটের পেছনে গ্রামবাংলার বহমান নদী ও নদীর পাড়ের দৃশ্য (নদীর বুকে নৌকা, পাড়ে পাটক্ষেত ও নৌকায় পাট বোঝাইয়ের দৃশ্য) এবং এর বাম পাশে বঙ্গবন্ধুর যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের একটি ছবি মুদ্রিত রয়েছে।

জান্নাতে রোজী

মুজিব শতবর্ষ সামনে রেখে বরগুনা জেলা প্রশাসন জেলার ৩০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (মাদ্রাসাসহ) শিক্ষার্থীদের জন্য চালু করেছে 'নন্দিনী হাইজিন কর্নার' নামে একটি কর্মসূচি। কর্নারে রাখা হয়েছে একটি বাক্সে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যানিটারি ন্যাপকিন, ফার্স্ট এইড, আয়রন বড়ি এবং একটি ঢাকনাওয়ালা ঝুড়ি।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে একজন ছাত্রী (নন্দিনী গার্ল), একজন ছাত্র (নোবেল বয়), একজন শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকসহ ১ হাজার ২২০ জনকে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষিতরা বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল ইউনিসেফের সহায়তায়। সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের ব্যয়ে এ কর্নার পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদকেও এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

'নন্দিনী হাইজিং কর্নার' কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরগুনা জেলা প্রশাসন ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত 'সার্ভে অন পার্সোনাল মিনস্ট্রুয়াল হাইজিং ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। এতে স্কুল-মাদ্রাসার ৩৮০জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এ জরিপ বলছে, মাসিকের সময় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮১ শতাংশ ও দাখিল মাদ্রাসার ৮৩ শতাংশ ছাত্রী পুরনো কাপড় ব্যবহার করে। এই সময়টাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৪ শতাংশ ও মাদ্রাসার ৮৬ শতাংশ ছাত্র শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে।

জেলা প্রশাসন বলছে, এ কর্মসূচির আওতায় সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, লিফলেট বিতরণ, পথ নাটকসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে মাসিক নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ কর্মসূচি সহায়তা করবে।

ঋতু কমিক বই

বয়ঃসন্ধি, মাসিক ও বেড়ে ওঠার গল্প নিয়ে বাজারে এসেছে কিশোর-কিশোরীদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। নাম 'ঋতু কমিক বই'। সদ্য সমাপ্ত একুশে গ্রন্থমেলায় ইএমকে সেন্টারের অর্থায়নে বইটি প্রকাশিত হয়। কমিক বইটিতে বিভিন্ন বয়সি চারজন নারীর আলাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কুসংস্কার ও দ্বিধার কথা বলা হয়েছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারবিধি থেকে শুরু করে মাসিকের দিনপঞ্জিকার নিয়ম শেখানো হয়েছে বইটিতে। এটিতে শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপও ওঠে এসেছে গল্পের ছলে। বইটির লেখক শারমিন কবীর। বয়ঃসন্ধি ও মাসিক নিরাপদ হোক। এর জন্য দরকার সচেতনতা। কমিক বইটি মাসিককে বুঝতে এবং সময়টা পাড়ি দিতে সহায়তা করবে বইটিতে এমন আশাই করেছেন শারমিন কবীর। ■

বিপরীত শব্দ

তারিক মনজুর

ভাষা-দাদু বুঝতে পারলেন কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। নইলে সবাই জোরে জোরে কথা বলবে কেন?

বিকাল বেলা। পুকুর পাড়ে নেহা, পিলটু, বিনু বসে আছে। কয়েকজনকে ভাষা-দাদু দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখলেন। ওদের ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, খেলা বাদ দিয়ে আজ শুধু কথাই বলবে ওরা।

'কী হয়েছে এখানে?' ভাষা-দাদু কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন।

ভাষা-দাদুকে এগিয়ে আসতে দেখে ওরা অবশ্য চুপ হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন শুনে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ভাষা-দাদু বললেন, 'কোনো জটিল সমস্যা মনে হয়!'

যারা বসে ছিল, এবার তারাও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। 'তোমরা যেহেতু দাঁড়িয়েই গেলে আমি না হয় খানিক সময় বসি এখানে।' এই বলে দাদু হাতের লাঠিতে ভর করে পুকুর পাড়ে বসে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আমাকে বলা না গেলে তোমরা না হয় বলো না! কিন্তু এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে? মাঠের দিকে খেলতে যাও!'

নেহাই প্রথমে মুখ খুলল। বলল, 'ওই পাড়ার ছেলেরা এই পাড়ার ছেলেদের বোকা বলেছে!'

বিনু সাথে যোগ করল, 'আর নিজেদেরকে ওরা বুদ্ধিমান বলেছে।'

ভাষা-দাদু গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আর কিছু?'

পিলটু বলল, 'সমস্যা হলো ওরা সবসময়ই এরকম বলে। মাঝে মাঝে বললেও মানা যেত।'

বিনু আবার যোগ করে, 'আরেকবার আমাদেরকে বলেছে অলস; আর নিজেদেরকে বলেছে পরিশ্রমী।'

ভাষা-দাদু হাসবেন না কাঁদবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'আমি তো খুব বেশি সমস্যা দেখছি না। আর সমস্যা থাকলে সমাধানও আছে। মন খারাপের কোনো কারণ নেই।'

'মন ভালোরও তো কোনো কারণ নেই!' বিনু বলে।

বিনুর কথা শেষ হওয়ার আগেই শাকের যোগ করে, 'আমরা ওদেরকে দেখে নেব!' গলা শুনে মনে হচ্ছে, ওর রাগটাই সবচেয়ে বেশি।

ভাষা-দাদু বললেন, 'প্রতিযোগিতা ভালো। তবে সেটা হতে হবে সুস্থ প্রতিযোগিতা। অসুস্থ প্রতিযোগিতা ভালো নয়।'

'প্রতিযোগিতার মধ্যে আবার সুস্থ-অসুস্থ আছে নাকি!' নেহা জানতে চায়।

ভাষা-দাদু বললেন, 'প্রতিযোগিতার মধ্যেও সুস্থ-অসুস্থ আছে। সুস্থ প্রতিযোগিতা ভালো; অসুস্থ প্রতিযোগিতা খারাপ।'

'সেটা আবার কেমন?' ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী পিলটু জানতে চায়।

'সেটা একটু পরে বলি। তবে তোমাদের যদি আজ খেলতে যেতে না-ই ইচ্ছা করে, তবে আমার পাশে বসতে পারো। সুস্থ-অসুস্থর মতো আরো কিছু শব্দ শোনাই।'

খেলতে যাওয়ার মতো মনের অবস্থা কারো ছিল না। সবাই তাই বসে পড়ল। ভাষা-দাদু বলতে লাগলেন, 'এ ধরনের শব্দকে বলা হয় বিপরীত শব্দ। এর একটিতে যা বোঝায়, অন্যটিতে ঠিক তার বিপরীত বোঝায়। যেমন, সুস্থর বিপরীত অসুস্থ। সুস্থ মানে অসুস্থ নয়। আর অসুস্থ মানে সুস্থ নয়।'

'এ তো সবাই বুঝতে পারছে। একটা আরেকটার বিপরীত', নেহা বলে, 'যেমন, ছোটো-বড়ো। ছোটো মানে বড়ো নয়। আর বড়ো মানে ছোটো নয়।'

ভাষা-দাদু হে-হে করে হাসতে লাগলেন, 'এখানেই তো মজা! বড়ো কিন্তু ছোটোর চেয়ে ছোটো হতে পারে!'

'মানে?' বিনু আর পিলটু একসঙ্গে বলে ওঠে।

'যেমন, মনে কর, আমি একটা বাক্য বলি। বড়ো একটা পিঁপড়া ছোটো একটা হাতির পিঠে বসে রয়েছে। ... এখানে বড়ো কিন্তু ছোটোর চেয়ে ছোটো। তাই না?'

'হ্যাঁ, তাই তো!' পিলটু বলার পর বিনুও মাথা ঝাঁকায়।

'দাদু, বিপরীত শব্দ তো আমরাও বইয়ে পড়েছি। কিন্তু এভাবে তো ভেবে দেখিনি!' নেহা বলে।

'বিপরীত শব্দ নিয়ে ভাবার আরো কিছু ব্যাপার আছে। যেমন, গভীরের বিপরীত কিন্তু অগভীর। একটা নদীর তুলনায় এই পুকুরটা অগভীর। নদীর গভীরতা হয়ত ৩০০০ ফুট। আর পুকুরের গভীরতা হয়তো ৩০ ফুট। নদীর জন্য সবাই বলে ৩০০০ ফুট গভীর। কিন্তু পুকুরের জন্য কেউ বলে না ৩০ ফুট অগভীর।'

'মজার ব্যাপার তো!' নেহা বলে।

'আর চরম বিপরীত বলেও কিছু নেই। যেমন, একজনকে ভালো আর একজনকে মন্দ বলি আমরা। এর মানে হলো, একজনের তুলনায় আরেকজন ভালো। কিংবা একজনের তুলনায় আরেকজন মন্দ।'

'কিন্তু, দাদু, ওই পাড়ার ছেলেরা সবসময় নিজেদেরকে ভালো বলে দাবি করে!' শাকেরের মাথার মধ্যে এখনও মান-অপমানের ব্যাপারটা ঘুরছে।

দাদু বললেন, 'আরেকটা কথা বলতে হয়। বিপরীত শব্দ মানে কেবল একটি শব্দ নয়। হাসি-কান্না, বোকা-বুদ্ধিমান এগুলো একক শব্দের বিপরীত জোড়। আবার গুচ্ছ শব্দেরও বিপরীত হয়। যেমন, এই পাড়ার ছেলেরা আর ওই পাড়ার ছেলেরা। কিংবা সুস্থ প্রতিযোগিতা আর অসুস্থ প্রতিযোগিতা।'

'দাদু, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি সুস্থ প্রতিযোগিতা আর অসুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা তো বোঝালে না।' পিলটু মনে করিয়ে দেয়।

দাদু একটু রাগের সাথেই বলেন, 'তোমরা এই পাড়া ওই পাড়া আলাদা করে যেভাবে প্রতিযোগিতায় নেমেছ, সেটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা। তার চেয়ে আমরা সুস্থ প্রতিযোগিতায় নামতে পারি।'

'সেটা কীভাবে?' বিনু জিগ্যেস করে।

'আগামী শুক্রবার এই পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা হবে। দুই পাড়ারই ছেলেমেয়ে অংশ নেবে। সবচেয়ে বেশি যে মাছ ধরতে পারবে, সে হবে সবার সেরা। আর সবচেয়ে কম মাছ ধরবে যে, সে হবে কম সেরা।'

'কিন্তু ওদের সাথে আমাদের যে শত্রুতা!' শাকের বলে।

'শত্রুতারও বিপরীত শব্দ আছে। আর সেটা হলো –'

'বন্ধুত্ব!' দাদু কথা শেষ করার আগেই নেহা বলে উঠল। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১.স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রথম গোলন্দাজ ইউনিটের নাম, বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের নাম

উপর-নিচ: ১. শেখ মুজিবের উপর লেখা প্রখ্যাত সাংবাদিক এবিএম মুসার একটি বই, ২. শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করেন কে, ৩. বঙ্গবন্ধুর যে কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, ৪. বঙ্গবন্ধুর উপর রচিত বিখ্যাত লেখক হুমায়ূন আহমেদের একটি গ্রন্থ, ৫. বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন

১.						■	২.
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	৩.				
	■	■		■	■	■	
■	৪.	■		■	৫.	■	
■		■		■		■	
■		■		■		■	

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: শেখ মুজিব, পেখম, মুজিবনগর, আগরতলা, রজনী, পারদ

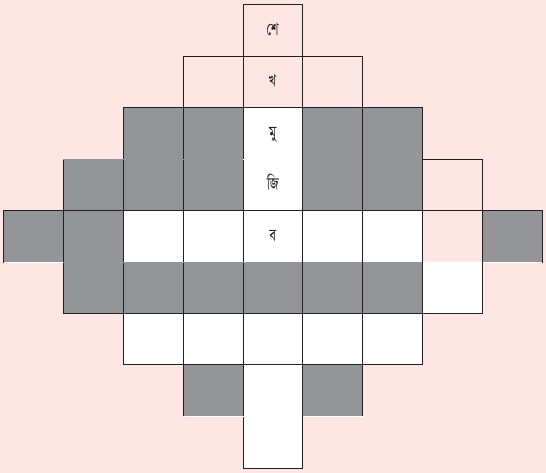

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

১	*		-	৬	=	
+	■	/	■	/	■	*
	+	২	-		=	৪
-	■	+	■	-	■	+
২	+		-	২	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৫	-		=	৯

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

১		১১	১২	৫৭				৫৩
	৩				৬১		৬৩	
	৮			৫৯		৬৫		
৬		১৬	১৫		৭৩	৬৬	৬৭	
১৯				৭৫		৭১		
	২৯	৩০	৭৭		৮১		৬৯	
			৩২	৭৯	৮০	৪৫		৪৭
	২৭	২৬			৩৭		৪৩	
২৩		২৫		৩৫				৪১

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হবে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No-9, March 2020, Tk-20.00

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, চতুর্থ শ্রেণি
ন্যাশনাল আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন স্কুল, পূর্ব রামপুরা ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা